ওরাও
কথা
বলে
ইউরি
দ্‌মিত্রিয়েভ

ইউরি
দমিত্রিয়েভ

ওরাও
কথা
বলে

Юрий Дмитриев
«ЗДРАВСТВУЙ, БЕЛКА!»

На языке бенгали.

Dmitriev Y.
HELLO, SQUIRREL!
In Bengali

মূল রুশ থেকে অনুবাদ: অরুণ সোম

অঙ্গসজ্জা: আ. রাইখস্টেইন ও ল. ওর্লোভা

প্রথম সংস্করণ

স্কুলের মাঝারি বয়সী ছেলেমেয়েদের জন্য

সোভিয়েত ইউনিয়নে মুদ্রিত

ISBN 5-05-000106-4

সূচী

গ্রন্থকারের নিবেদন

মানুষ হাজার হাজার বছর ধরে জীব-জন্তুর কণ্ঠস্বর শুনে আসছে, তাদের আচার-আচরণের প্রতি লক্ষ্য রাখছে। কিন্তু লোকে তাদের চোখের দেখা ও কানের শোনা ব্যাপারকে বিভিন্ন রকম ভাবে গ্রহণ করেছে। কেউ কেউ জীব-জন্তুর কণ্ঠস্বর এবং তাদের আচরণের প্রতি আদৌ কোন মনোযোগ দেয় নি, সেগুলির উপর কোন গুরুত্বই আরোপ করে নি। কেউ কেউ করেছে ঠিক তার উলটোটা — জীব-জন্তুর আচার-আচরণের উপর বড় বেশি গুরুত্ব আরোপ করেছে — তাদের মতে, মানুষের মতো জীব-জন্তুও কথাবার্তা বলে, পরস্পরকে সংবাদ জানায়, নিজেদের মধ্যে চিন্তাভাবনা অথবা অভিজ্ঞতার বিনিময় করে। আবার কারও কারও মতে — এ ধরনের লোকও অবশ্য কম নয় — জীব-জন্তুরা কেবল যে কথাবার্তা বলে অথবা নিজেদের মধ্যে চিন্তাভাবনার বিনিময় করে তাই-ই নয়, তারা তাদের আচার-আচরণের মাধ্যমে ভবিষ্যতের কোন পূর্বাভাস দেয়, মানুষকে কিছু একটা জানায়।

এই ভাবে অনেক অনেক বছর কেটে যায় — কার কথা যে সত্যি, বলা অসম্ভব হয়ে পড়ে। মাত্র নেহাৎই হাল আমলে বিজ্ঞানীরা জীব-জন্তুর আচার-আচরণ সম্পর্কে গুরুত্বসহকারে অনুশীলন করার পর বুঝতে পারেন যে যারা জীব-জন্তুর প্রতি কোন মনোযোগ দেয় নি তাদের ধারণা যেমন ঠিক নয়, তেমনি যারা মনে করে যে জীব-জন্তুরা মানুষের মতো, এমনকি 'অতিমানবীয়' চিন্তাভাবনার ক্ষমতা রাখে তাদের ধারণাও ঠিক নয়।

উদ্ভব ঘটল এক বিশেষ বিদ্যার, জীব-জন্তুর আচার-আচরণ, বিশেষত জীব-জন্তুর 'ভাষা' অনুশীলন যার উদ্দেশ্য। ইথলজি নামে পরিচিত এই বিদ্যা অন্যান্য বিজ্ঞানের তুলনায় এখনও বেশ নতুন। ইতিপূর্বে এই নামে কোন বিজ্ঞান ছিল না, তার উদ্ভবও সম্ভব ছিল না। ইথলজি, অর্থাৎ জীব-জন্তুর আচরণসংক্রান্ত বিজ্ঞানের যাতে উদ্ভব ঘটে তার জন্য অন্যান্য বিজ্ঞানেরও — পদার্থবিদ্যা ও রসায়নবিদ্যা, বলবিদ্যা ও মনোবিদ্যা,

ইতিহাস ইত্যাদি জ্ঞানবিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার পরম উন্নতি ঘটা দরকার ছিল। ঐ সমস্ত বিজ্ঞান ছাড়া জীব-জন্তুর আচরণসংক্রান্ত বিজ্ঞানের উদ্ভব অসম্ভব ছিল। তাছাড়া জীব-জন্তুদের আচার-আচরণ ও ভাষা অনুশীলনের জন্য নানা ধরনের জটিল যন্ত্রপাতি, সরঞ্জাম, কম্পিউটার ইত্যাদিরও প্রয়োজন। এখন মানুষ এগুলি তৈরি করতে শিখছে।

ইথলজির জন্ম হল। এই বিদ্যার উদ্ভবের প্রায় সঙ্গে সঙ্গে মানুষের সামনে তার জ্ঞানের পরিধি এতদূর বিস্তৃত হল যে বিজ্ঞানীদের বিস্ময়ের অবধি রইল না—বহু রহস্য ও আবিষ্কারের দ্বারপ্রান্তে উপনীত হলেন তাঁরা।

অদূর ভবিষ্যতে মানুষ কী কী ধরনের আবিষ্কার করবে এবং সেই আবিষ্কারগুলি পদার্থবিজ্ঞানী, চিকিৎসক, প্রযুক্তিবিদ ও ডিজাইনারদের কী ভাবে সাহায্য করবে তা আমাদের পক্ষে আজ ধারণা করাও কঠিন। মানুষের কার্যকলাপের বহুবিধ ক্ষেত্রের জন্য এই আবিষ্কারগুলি খুবই প্রয়োজনীয়।

জীব-জন্তুর আচার-আচরণের অনুশীলনের ফলে সেই সঙ্গে মানুষের পক্ষে জীব-জন্তুকে রক্ষা করাও সম্ভব হয়ে উঠবে।

আর এটাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। বিশেষ করে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দেখা দিয়েছে এখন।

মানুষ পৃথিবীতে তার অস্তিত্বের একেবারে শুরু থেকে নিরন্তর সুদৃঢ় বন্ধনে জীব-জন্তুর সঙ্গে সম্পর্কিত। প্রাচীন মানুষেরা জীব-জন্তু শিকার করে জীবন ধারণ করত—মাংস খেত, পশুচর্ম দিয়ে পোশাক তৈরি করত, হাড় দিয়ে তৈরি করত নিজেদের নিত্যপ্রয়োজনীয় নানা ধরনের জিনিস।

তারপর মানুষ জীব-জন্তুকে পোষ মানাতে শুরু করল। অবশ্য পশুশিকারও বন্ধ রইল না। গৃহপালিত জীব-জন্তুর সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে লাগল, বন্য জন্তুজানোয়ার কমে আসতে লাগল। মানুষ যে-সমস্ত পশুপাখি শিকার করত কেবল তাদের সংখ্যাই যে কমে আসতে লাগল তা নয়, মোটের ওপর মানুষের কার্যকলাপের সামনে পশুজগৎ পিছু হটতে শুরু করল। তার কারণ এই যে মানুষ লেগে গেল শহর তৈরি করতে, সে জলাভূমি শুকোয়, ফসল বোনার জন্য জমি চাষ করে, বনজঙ্গল কাটে। বলাই বাহুল্য জীব-জন্তুর জীবনের ওপর মানুষের এ সমস্ত কার্যকলাপের প্রভাব পড়তে থাকে, এর ফলে জীব-জন্তুর সংখ্যাও কমে আসতে থাকে। কিন্তু বিশেষ করে যে-সমস্ত জীব-জন্তুকে মানুষ শিকার করত তাদের অবস্থা সঙ্গীন হয়ে এলো। এখন মানুষ কেবল নিত্যপ্রয়োজনের তাগিদেই শিকার করে না—মানুষ পশুচর্ম প্রসেসিং করতে শিখেছে, প্রচুর অর্থের বিনিময়ে পশুচর্ম সে বিক্রি করতে পারে, পশুর চামড়া, পশম, কষের দাঁত আর হাড় কী কী কাজে লাগানো যেতে পারে তাও সে জানে, মানুষ মাংস সংরক্ষণ করাও শিখেছে। ফলে জীব-জন্তু নিধনযজ্ঞ চলল ব্যাপক হারে। এদিকে আবার দেখা দিল শখের শিকারীরা, স্রেফ পশুনিধনেই তাদের আনন্দ। সে কার্যসাধনও ততটা কঠিন নয়—পশুশিকারীরা আর আগেকার মতো তীরধনুক বা বর্শা ব্যবহার করে না, তাদের হেফাজতে আছে অপ্‌টিক্যাল নিশানা লাগানো অটোমেটিক বন্দুক, দ্রুতগামী মোটরগাড়ি, এমনকি হেলিকপ্টার।

পৃথিবীর পশুজগৎ আজ এত বদলে গেছে যে তাকে আর চেনা যায় না। এতে আশ্চর্য হওয়ারও কারণ নেই। দৃষ্টান্তস্বরূপ, আফ্রিকায় ইউরোপীয়দের আগমনের পূর্ব পর্যন্ত যত জীব-জন্তু ছিল বর্তমানে তার মাত্র দশ শতাংশ অবশিষ্ট আছে।

বিগত দুই শতকের মধ্যে প্রায় ৩০০ জাতের বিভিন্ন পশুপাখি সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হয়েছে, ধ্বংস হয়েছে, পৃথিবীর বুক থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। জরুরী ব্যবস্থা অবলম্বন না করা হলে প্রায় ৫০০ জাতের পশুপাখিরও ঐ একই দশা ঘটার আশঙ্কা আছে। দুর্ভাগ্যবশত বহু

জীব-জন্তুকে এখন আর রক্ষা করাই সম্ভব নয় (হয়ত কিছুকালের জন্য এখনও কোন কোন চিড়িয়াখানায় অথবা সংরক্ষিত বনাগারে তারা টিকে আছে)। কিন্তু অবশিষ্ট যারা আছে তাদের রক্ষা করতেই হবে, এটা মানুষের কর্তব্য।

পৃথিবীতে জীব-জন্তু সংরক্ষণের গুরুত্ব কতখানি সে সম্পর্কে তোমরা যেমন এই বই থেকে কিছু কিছু জানতে পারবে, তেমনি লেখক ও বিজ্ঞানীদের লেখা অন্যান্য বই থেকেও জানতে পারবে। ইচ্ছা হলে তোমরা সে সমস্ত বই পড়তে পার। তাহলে বুঝতে পারবে জীব-জন্তু কেবল আমাদের মাংস ও পশমের যোগানদারই নয়। ইঞ্জিনীয়র, ডিজাইনার ও জীববিজ্ঞানীরা জীব-জন্তুদের সম্পর্কে চর্চা করতে গিয়ে বিস্ময়কর নানা যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম তৈরি করে থাকেন। মানুষ জীব-জন্তুদের কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে, তাদের গোপন রহস্য আবিষ্কার করে, আর — বর্তমানে এটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে — জীব-জন্তুদের 'সাহায্য' ছাড়া বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার বিকাশ সম্ভব নয়।

কিন্তু এটাই সব নয়। বর্তমানে সকলের কাছে একটা ব্যাপার স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে কলকারখানা, মোটরগাড়ি ও ব্লাস্ট ফার্নেস — এবং শিল্পসংক্রান্ত আরও বহু নির্মাণকর্ম, সেই সঙ্গে যানবাহনও আবহাওয়া দূষিত করে তোলে। একসময় আবহাওয়া এত দূষিত হয়ে যেতে পারে যে তখন পৃথিবীতে জীবনধারণই অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে। আবহাওয়া বিশুদ্ধ করে উদ্ভিদকুল। কিন্তু গাছপালা পোকামাকড় ছাড়া বাঁচতে পারে না। পোকামাকড়ও কিন্তু আছে বিভিন্ন রকমের — যেমন উপকারী, তেমনি ক্ষতিকর। ক্ষতিকর পোকামাকড় যদি খুব বেশি পরিমাণে বৃদ্ধি পায়, তাহলে তারা পৃথিবীর সমগ্র উদ্ভিদকুল ধ্বংস করে ফেলতে পারে। কিন্তু এমন ঘটনা ঘটে না, তার কারণ এই যে এমন সমস্ত পাখি আর নানা ধরনের পশু আছে যারা ক্ষতিকর পোকামাকড় ধ্বংস করে। এই সব পশুপাখি যাতে পৃথিবীতে বেঁচে থাকতে পারে তার জন্য অন্যান্য জন্তুজানোয়ারেরও — যেমন হিংস্র প্রাণী ইত্যাদিদেরও বেঁচে থাকা আবশ্যক। তার মানে, দাঁড়াচ্ছে এই যে পৃথিবীতে যাতে জীবনের ধারা অব্যাহত থাকে তার জন্য দরকার বিশুদ্ধ আবহাওয়া, বিশুদ্ধ আবহাওয়ার জন্য দরকার গাছপালা, আর পৃথিবীতে গাছপালা যাতে বেঁচে থাকে তার জন্য জীব-জন্তু অবশ্যপ্রয়োজনীয়। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে আমাদের এই গ্রহে প্রাণসংরক্ষণের সংগ্রামে জীব-জন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার অধিকারী, অন্যতম চূড়ান্ত ভূমিকার অধিকারী।

কিন্তু এটাও আবার সব নয়। জওহরলাল নেহরু বলেছেন, 'আমাদের অপূর্ব সুন্দর পশুপাখিদের অস্তিত্ব যদি না থাকত, তাহলে জীবন সঙ্গে সঙ্গে হয়ে পড়ত একঘেয়ে, বর্ণবৈচিত্র্যহীন।' আর বাস্তবিকই পশুপাখি ছাড়া পৃথিবীতে জীবন ধারণাই করা যায় না।

এই সব কথা মনে রাখলে মানুষের পক্ষে পৃথিবীর প্রাণিজগতের ভাগ্য সম্পর্কে গভীর চিন্তা না করে কোন উপায় থাকে না, প্রাণিজগৎ রক্ষার জন্য সক্রিয় সংগ্রামে তখন তাকে নামতেই হয়। এর জন্য সর্বাগ্রে অবশ্যই জানতে হবে জীব-জন্তুদের, জানতে হবে তাদের জীবনের রীতিনীতি, তাদের আচরণ, 'চরিত্র', 'ভাষা'। সুতরাং দেখতেই পাচ্ছ, ইথলজি নামে যে বিজ্ঞান, তার উদ্ভব বিজ্ঞানীদের নিছক কৌতূহল বা খেয়াল থেকে নয়—এর রীতিমতো প্রয়োজন ছিল।

জীব-জন্তুর আচার-আচরণ, তাদের কথাবার্তা, তাদের ভাষা সম্পর্কে মানুষ ইতিমধ্যে যা যা জানতে পেয়েছে এই বইয়ে তার মাত্র সামান্য একটি অংশই বর্ণিত হয়েছে। মানুষ যা কিছু জানতে পেয়েছে তার সবটা একটা বইতে লেখা সম্ভব নয়, এমনকি এর চেয়ে আরও বহুগুণ মোটা বইতেও তার স্থান সঙ্কুলান হবে না। তাছাড়া তোমাদের কাছে সবকিছু বলতেও আমি বসি নি। আমার ইচ্ছে যারা এই বইটি পড়বে তারা যেন বুঝতে পারে আমাদের চারপাশের কত আশ্চর্য, কত রহস্যই না এখনও জানতে বাকি আছে! কেবল নিবিড় অরণ্যের

ভেতরই যে এ জগৎ মানুষকে ঘিরে আছে তা নয়, এ জগৎ বিরাজ করছে সর্বত্র।

যে-সমস্ত বিজ্ঞানী মরুভূমি ও পাহাড়পর্বতে ভ্রমণ করেছেন, বনেজঙ্গলে জীব-জন্তুদের জীবনযাত্রা পর্যবেক্ষণ করেছেন, এমনকি সেই উদ্দেশ্যে সাগরের তলায়ও নেমেছেন, তাঁদের লেখা বইপুথি আমি পড়েছি। এটা অবশ্যই খুবই আকর্ষণীয়। কিন্তু আমি নিজে ছোট বনের প্রান্তদেশে, বাগানে, উঠোনে, এমনকি ঘরের ভেতর জীব-জন্তুদের জীবনযাত্রা লক্ষ্য করেছি, আর সেটাও খুবই আকর্ষণীয়; কেননা এমন কোন জীব-জন্তু নেই যাদের দেখতে একঘেয়ে লাগে, যারা আকর্ষণীয় নয়। সাধারণ একটা মাছি, গৃহপালিত পাখি, কিংবা তোমার বাড়ির কাছেপিঠে বাসা বেঁধেছে এমন কোন পাখি তোমাদের কাছে এমনই নৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে যে তোমরা তাদের লক্ষ্যই কর না, অথচ তাদের মধ্যে বিস্ময়কর গোপন রহস্য আছে এবং আজ হোক কাল হোক সে রহস্য তারা মানুষের সামনে উদ্ঘাটন করবে। হয়ত বা তোমরাই তাদের জীবনযাত্রা লক্ষ্য করে ঐ সমস্ত রহস্য উদ্ঘাটনের দিকে প্রথম পদক্ষেপ করবে।

সবচেয়ে বড় কথা, যেটা আমি বলতে চাই তা হল এই যে এ বইয়ের পাঠক যেন বুঝতে পারে, যেন চিরকাল মনে রাখে জীব-জন্তুদের ভালোবাসা ও তাদের রক্ষা করার গুরুত্ব কতখানি। জীব-জন্তুদের রক্ষা করার অর্থ হল পৃথিবীর সৌন্দর্য রক্ষা করা, পৃথিবীর প্রাণরক্ষার জন্য যত্ন নেওয়া।

মানুষ পরম শক্তিমান, পরম জ্ঞানী। তাই জীব-জন্তুদের সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে তাকে হতে হবে মহৎ, উদার ও বিচক্ষণ।

ইউরি দুমিত্রিয়েভ

এ বইয়ের বিষয়বস্তু

একজন লোক বনের ভেতর দিয়ে যেতে যেতে দেখতে পেল ডাল থেকে ডালে, গাছ থেকে গাছে লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়াচ্ছে বাদামী রঙের এক কাঠবিড়ালি। বড় সুন্দর, খোশমেজাজী কাঠবিড়ালি।

'পেন্নাম হই গো কাঠবিড়ালি!' লোকটা বলল।

কাঠবিড়ালি থমকে দাঁড়িয়ে চোখ কোঁচকাল। তারপর গোল-গোল চালাক-চালাক চোখজোড়া মেলে তার দিকে তাকিয়ে জবাব দিল:

'পেন্নাম হই গো মানুষের পো!'

এই বলে কাঠবিড়ালি লেজ নাড়িয়ে লাফাতে লাফাতে চলে গেল তার নিজের কাজে।

ভূমিকা

পাঠকের প্রতি গ্রন্থকারের কিঞ্চিৎ নিবেদন

আর এই সময় — একটু আগে কিংবা একটু পরেও হতে পারে — আরেকটি লোক এক চওড়া নদীর বুকে নৌকো চড়ে যাচ্ছিল। সে দেখতে পেল পাড়ের কাছাকাছি পড়ে আছে একটা গুঁড়ি। নৌকো চালিয়ে খানিকটা কাছে আসতে ঠাহর করে দেখল, মোটেই গুঁড়ি নয়, একটা কুমীর। এতে ভয় পেয়ে মানুষের পালিয়ে যাওয়ার কথা, কিন্তু এ লোকটা করল তার উল্‌টো। সে আরও কাছে এগিয়ে এলো। এগিয়ে এসে চেঁচিয়ে বলল:

'কেমন আছ কুমীর ভায়া?'

কুমীর মাথা তুলল, তার বিশাল ভয়ঙ্কর হাঁ খুলল, গাঁক গাঁক করে জবাব দিল:

'এই এক রকম, ধন্যবাদ, আছি মন্দ না!'

তৃতীয় আরেকজন লোক। সে কোথাও হেঁটে যাচ্ছিল না, নৌকো চড়েও যাচ্ছিল না। কাজ করছিল বাগানে। এমন সময়, যে গাছের নীচে লোকটা কাজ করছিল, তার ওপর এসে বসল একটা নীলকণ্ঠ পাখি।

'কাজ-কারবার কেমন চলছে হে পাখির ছানা?' লোকটা জিজ্ঞেস করল।

'কাজ অনেক!' কিচির-মিচির করে নীলকণ্ঠ পাখি বলল।

এরপর ওরা কথাবার্তা বলতে লাগল।

এবারে হয়ত তোমরা মুচকি হাসবে, বলবে: এসব গল্পকথা! এমন হয় না!

মানলাম। আমি তর্ক করব না। আমি বলব অন্য এক কাহিনী।

শো দেখানোর জন্য একদল শেখানো-পড়ানো বানর নিয়ে জার্মান গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র থেকে লেনিনগ্রাদে এক অভিনেত্রী এলেন। শহরের সর্বত্র পোস্টার পড়ল। বলাই বাহুল্য, অনুষ্ঠানের সব টিকিট চটপট বিক্রি হয়ে গেল।

কিন্তু অনুষ্ঠানের দিনে সার্কাসের দরজায়-দরজায় নোটিশ পড়ল — তাতে লেখা ছিল যে বানরগুলো অসুস্থ হয়ে পড়ায় অনুষ্ঠান বাতিল করে দেওয়া হল।

এমন ঘটনা ঘটায় দর্শকদের বড় আফসোস হল। অনেকেই সার্কাসে এলো, টেলিফোন করল, জানতে চাইল বানরেরা শিগ্‌গির সুস্থ হয়ে উঠবে কিনা, শিগ্‌গির তাদের সারিয়ে তোলা যাবে কিনা।

কিন্তু চিকিৎসা করা ত দূরের কথা, বানরেরা কাউকে তাদের পরীক্ষাই করতে দিল না। যে সমস্ত লোকজন ওদের দেখাশোনা করত তাদের কেউ—এমনকি যাকে ওরা এত ভালোবাসত সেই ট্রেনার মহিলা অবধি—খাঁচায় ঢোকার চেষ্টা করামাত্রই বানরেরা চেঁচামেচি শুরু করে দেয়, ঘুষি পাকিয়ে হাত নাড়ে আর দাঁত কড়মড় করে ভয় দেখায়।

এমন সময় একদিন একেবারেই অচেনা একটি লোক খাঁচার দিকে এগিয়ে এলো। বুঝতেই পারছ বানরেরা কী রকম সোরগোল তুলল।

লোকটা কিন্তু তাতে ঘাবড়ে না গিয়ে সাহস করে খাঁচার ভেতরে ঢুকল। এমন স্পর্ধা দেখে বানরেরা প্রথমটায় হতভম্ব হয়ে গেল, তবে পরক্ষণেই ধাতস্থ হওয়ার পর ওরা আগন্তুকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। আর একটি মুহূর্ত — তারপরই... তারপরই হঠাৎ সব পাল্‌টে গেল। বানরেরা থমকে গেল, শেষে পলকের মধ্যে অচেনা লোকটির কাছে ছুটে এসে তার গা ঘেঁষে দাঁড়াল, ওদের চেঁচামেচি থেমে গেল।

এর পর ওরা ডাক্তারের পরীক্ষায় আপত্তি করল না, ইঞ্জেকশন দিতে দিল, শান্ত হয়ে ওষুধও খেল।

লক্ষ্য করে দেখ — বানরেরা এর আগে কখনও এ লোকটাকে দেখে নি। কিন্তু বানরদের আচার-আচরণ ও চরিত্র লোকটার ভালোমতো জানা ছিল। খাঁচায় ঢোকার সময় সে খুব আস্তে করে বানরদের লক্ষ্য করে

মাত্র একটি কথাই 'বলে'। দেখা গেল বানরেরা যাতে তাদের আচরণ পাল্‌টায় তার জন্য সেটা যথেষ্ট!

তার মানে, এমন কথাও আছে?

হ্যাঁ, আছে।

এমনও ত হতে পারে যে বানুরে ভাষাও আছে?

হ্যাঁ, আছে। কেবল বানুরে ভাষাই বা বলি কেন — পাখি, বেঙ, খরগোস, কুমীর, কাঠবিড়ালিরও ভাষা আছে, এমন কি মাছিরও আছে।

বইটিতে এ সম্পর্কে পড়তে পারবে, জানতে পারবে যে পশু-পাখিরা নানা ভাষায় 'কথাবার্তা' বলতে পারে — কেবল শিস বা চিৎকারের ভাষায় নয়, নাচের ভাষায়ও, এমনকি আলোর ভাষায় পর্যন্ত।

কিন্তু পশু-পাখির ভাষা নিয়ে আলোচনা শুরু করার আগে একটা বিষয় ঠিক করে ফেলা যাক — আমাদের মানবিক ভাষার সঙ্গে এ ভাষার কোন মিলই নেই। আমি তোমাদের কাছে এ ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলার চেষ্টা করব, তোমরা বোঝার ও মনে রাখার চেষ্টা কর।

তাছাড়া ব্যাখ্যা করার মতোও কিছু আছে বলে তা মনে হয় না। তোমরা বলবে, সে ত বটেই — পশু-পাখির ভাষা ত আর মানুষের ভাষার মতো নয়। মানুষ শব্দ দিয়ে কথা বলে, আর পশু-পাখিরা শিস দেয় কিংবা চিৎকার করে অথবা গর্জন করে।

হ্যাঁ, এটা ঠিকই যে তফাৎ আছে। তবে...

আফ্রিকার উত্তর-পশ্চিম উপকূলে অবস্থিত একটা ছোট দ্বীপে — হোমার দ্বীপে — এমন সব লোকজন বাস করে যারা শিসের ভাষায় কথা বলতে পারে। তারা অবশ্য শব্দের সাহায্যেও কথা বলতে পারে, তবে কখনও কখনও তাদের কাছে শিসের ভাষার গুরুত্ব অনেক বেশি।

হোমার দ্বীপ উঁচু উঁচু পাহাড়ে ঢাকা, পাহাড়ের মাঝখানে গভীর গিরিখাত। এক গাঁ থেকে আরেক গাঁয়ে সোজা পথে যেতে পারলে হয়ত তেমন দূর নয়, কিন্তু সোজা পথে কখনই যাওয়া যায় না — কঠিন খাড়া গা বয়ে কষ্টেসৃষ্টে ওপরে উঠতে হয়, খাড়া পায়ে-চলা-পথে নিচে নামতে হয়, অতল গিরিখাত আর খরস্রোতা পাহাড়ী নদী পার হতে হয়। কখন কখন কয়েক কিলোমিটার পার হতে সারা দিন লেগে যায়। পড়শীকে সংবাদ জানাতে কিংবা তাকে নিমন্ত্রণ করতে ইচ্ছে হয়, কিন্তু কী ভাবে তা করা যায়? দ্বীপের বাসিন্দারা কিন্তু এর একটা উপায়ও বার করেছে।

তারা ভেবে বার করেছে শিসের ভাষা — সিল্‌বো। কঠিন খাড়া জায়গা, গিরিখাত — কোনটাই শিসের পক্ষে বাধা নয়। এক রাখাল থেকে আরেক রাখালের কাছে, গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে শিস উড়ে চলে।

এ শিস সাধারণ শিস নয় — কখনও নামে, কখনও ওঠে, আস্তে হয় কিংবা জোরে হয়, মাঝে মাঝে থেমে যায়, আরও চড়া হয় কিংবা আরও সুরেলা হয়। যে-লোক শিস দিচ্ছে সে যা বলতে চায় শ্রোতা তা বেশ বুঝতে পারে। সংবাদ যদি সকলের কাছে আকর্ষণীয় হয়, তাহলে সঙ্কেত যে গ্রহণ করছে সে তা আরও দূরে পাঠিয়ে দেয় এবং দেখতে দেখতে গোটা দ্বীপ বার্তা জানতে পারে।

যে-লোক শিস দিচ্ছে সে যদি কেবল তার পড়শীকে নিছক কোন কিছু বলতে কিংবা জিজ্ঞেস করতে চায়, তাহলে পড়শী জবাব দেয়। এই ভাবে তারা কথাবার্তা বলে। শব্দ ছাড়া, অথচ সবই বোধগম্য।

'আচ্ছা শিস দিতে হয় কেন? কেবল চেঁচিয়ে ডাকলে কি চলে না?' তোমরা হয়ত জিজ্ঞেস করবে।

দেখা যাচ্ছে তাতে চলে না। পাহাড়-পর্বতে কণ্ঠস্বর তাড়াতাড়ি হারিয়ে যায়, কিন্তু পাহাড়ী বাতাসের বিশেষত্ব এমনই যে তার কল্যাণে শিস অনেক দূর পর্যন্ত ভেসে যায় — চৌদ্দ কিলোমিটার দূরেও তা শোনা যায়।

শিসের ভাষা যে কেবল হোমার দ্বীপেই আছে তা নয়। ফ্রান্স ও স্পেনের সীমান্তবর্তী পিরেনিস পর্বতমালার মধ্যে আস্‌ নামে এক ছোট্ট গ্রাম আছে। সেখানকার অধিবাসীরা শিসের ভাষায় দিব্যি কথাবার্তা বলে। যুদ্ধের সময় এই ভাষা গেরিলাদের খুব সাহায্য করে — শিসের আদান-প্রদান করা যেত, একে অন্যকে নানা সংবাদ পাঠাতে পারত, বিপদ সম্পর্কে সাবধান করে দিতে পারত — ফাশিস্তদের কিছুই বোঝার উপায় ছিল না।

সম্প্রতি বিজ্ঞানীরা তুরস্কে উঁচু পাহাড়-পর্বতের মধ্যে একটি গ্রাম আবিষ্কার করেন। গ্রামটির নাম পক্ষিগ্রাম, কেননা সেখানকার অধিবাসীরা শিসের এই ভাষায় কেবল যে কথাবার্তাই চালায় তা নয়, এমনকি ঝগড়াঝাঁটি করে, মিটমাটও করে।

আমেরিকায় বসবাসকারী বহু রেড ইন্ডিয়ান গোষ্ঠীও শিস দিয়ে নানা সমাচার জানাতে পারে। আর সম্ভবত একমাত্র তারাই নয়।

শিসই একমাত্র শব্দহীন ভাষা নয়। তবে অন্য যেগুলি সম্পর্কে আমি এখন বলব তাদের সঙ্গে এর অনেক তফাৎ। শিস বাস্তবিকই ভাষা। এ ভাষায় যা খুশি তা-ই বলা যায়, এর সাহায্যে যে-কোন বাক্যাংশ, যে-কোন বাক্য গড়া যায়।

আরেকটি সুপ্রচলিত শব্দহীন ভাষা হল ঢাকের ভাষা। আফ্রিকা ও দক্ষিণ আমেরিকার অধিবাসীদের মধ্যে এবং ঐ দুই মহাদেশের চতুষ্পার্শ্বস্থ দ্বীপে বসবাসকারী গোষ্ঠীদের মধ্যে আজও প্রায়ই এ ভাষার চল দেখা যায়। এ ভাষায় সিল্‌বোর মতো অত বেশি কথা বলা যায় না। তবে শিস যেখানে একই ভাষাভাষী লোকেরা ব্যবহার করতে পারে সেখানে সম্পূর্ণ ভিন্ন ভিন্ন ভাষাভাষী লোকদের কাছেও ঢাকের

গুরগুর বা আঘাত বোধগম্য। এই কারণে, উদাহরণস্বরূপ, আফ্রিকার এক প্রান্ত থেকে পাঠানো বার্তা বিদ্যুৎগতিতে — কখনও কখনও চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে — মহাদেশের অন্য প্রান্তে পেঁছে যায়। এক গ্রাম থেকে অন্য গ্রামে বার্তা পাঠানোর সময় ঢাক বাদ্যির টেলিগ্রাফ দ্রুত তা দেশের গহনতম প্রান্তে বয়ে নিয়ে যায়।

ঢাকের বাদ্যি বিজয় ও পরাজয়ের সংবাদ জানায়, নেতাদের ও রাজা-রাজড়ার হুকুমনামা পাঠায়। যেমন, ইতালি ও আবিসিনিয়ার যুদ্ধের সময় — এখন এদেশের নাম ইথিওপিয়া — ঢাকের বাজনা সর্বস্তরে আবিসিনীয়দের যুদ্ধপ্রস্তুতির কথা ঘোষণা করে। কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই সম্রাটের আদেশ সারা দেশে রাষ্ট্র হয়ে পড়ে।

এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছুই নেই যে আফ্রিকার কোন কোন উপজাতি বাসস্থান বদল করতে গিয়ে এবং গ্রামের জন্য পছন্দমতো জায়গা খুঁজে বার করার পর প্রথমেই সেখানে ঢাক বসায়, তারপর নিজেদের বাসগৃহ নির্মাণের কাজ শুরু করে।

যোগাযোগের আধুনিক উপায় — রেডিও, টেলিগ্রাফ, টেলিফোন — আমেরিকার রেড ইন্ডিয়ানদের কাছে এবং আফ্রিকার উপজাতিদের কাছে পেঁছুবে ঠিকই। কিন্তু শব্দহীন ভাষা লোপ পাবে না। সে ভাষা এখনই নতুন ভূমিকা গ্রহণ করছে।

টেলিগ্রাফিক ভাষা — মোর্সের বর্ণমালার কথা তোমাদের নিশ্চয়ই জানা আছে। ঐ বর্ণমালায় আগে থেকে নির্দিষ্ট চিহ্ন হিশেবে আছে বিন্দু আর ড্যাশচিহ্নের নানা রকম সমাবেশ। যেমন 'এ' হল বিন্দু আর ড্যাশ, 'বি' — একটা ড্যাশ আর তিনটে বিন্দু, 'সি' হয় ড্যাশের পর বিন্দু তারপর আবার ড্যাশ আর বিন্দু দিয়ে ইত্যাদি। কখনও কখনও টেলিগ্রাফের ফিতেয় এই বিন্দু ও ড্যাশ পাঠানো হয়, আবার কখনও কখনও টেলিগ্রাফ অপারেটর কানে শুনে সেগুলি গ্রহণ করে। অল্পক্ষণের পিনপিনে আওয়াজ মানে বিন্দু, আরেকটু দীর্ঘ — ড্যাশ। মোর্সের সঙ্কেত দ্রুত কাজ করে চলে, মনে হয় কিছুই বোঝা সম্ভব নয়। কিন্তু অপারেটর মনোযোগ দিয়ে শোনে, বিন্দু আর ড্যাশ তার কাছে শব্দ হয়ে ওঠে, শব্দ থেকে হয় বাক্য।

শব্দহীন ভাষা কেবল যে ধ্বনিগ্রাহ্য হতে পারে তা নয়, দৃষ্টিগ্রাহ্যও হতে পারে। যেমন সার্চ লাইটের আলো জ্বলে উঠল। জ্বলেই নিভে গেল। ঝলক হয় কখনও খানিকটা দীর্ঘ কখনও বা খানিকটা খাটো। এটাও কিন্তু মোর্সের বর্ণমালা, কেবল আলোক-বর্ণমালা। খাটো ঝলক — বিন্দু, দীর্ঘ ঝলক — ড্যাশ। আবার আলোকের বিন্দু ও ড্যাশ নিয়ে গড়ে ওঠে শব্দ।

এবারে আরও একটি শব্দহীন ভাষা — ফ্ল্যাগ হাতে সিগন্যাল-কর্মী। অভিজ্ঞ চোখ সহজেই সিগন্যাল হৃদয়ঙ্গম করতে পারে এবং সিগন্যাল-কর্মী যা বলে তার সব কিছুই বুঝতে পারে।

তোমরা অবশ্যই জিজ্ঞেস করতে পার এসব আমি তোমাদের কেন বলছি, এখানে পশু-পাখির ভাষার ব্যাপারই বা কোত্থেকে আসছে? বলার উদ্দেশ্যটা হল গুলিয়ে যাতে না ফেল তার জন্য সঙ্গে সঙ্গে সতর্ক করে দেয়া; কেননা মনে হতে পারে যে মানুষের শব্দহীন কথাবার্তা আর পশু-পাখির কথাবার্তার মধ্যে বুঝি বিশেষ কোন তফাৎ নেই: হোমার দ্বীপের বাসিন্দারা শিস দেয় আবার পাখিরাও শিস দেয়; টেলিগ্রাফের টরে-টক্কা কিংবা ঢাকের সঙ্কেত, এই ধর না কেন, কাঠঠোকরার ঠকঠক আওয়াজের সমগোত্রীর। কিন্তু এই মিল বাইরের মাত্র। আসলে সদৃশ ধ্বনিগুলির মধ্যে তফাৎ বিরাট; কেননা মানুষ যে-কোন সঙ্কেতকে

শব্দে রূপান্তর করবেই। আর শব্দের পেছনে নির্দিষ্ট ধারণা এসে দাঁড়াবেই।

আচ্ছা, ধরা যাক অপারেটর নানা সমাবেশ সাজানো বিন্দু ও ড্যাশ গ্রহণ করছে। সে দ্রুত মনে মনে বিন্দু ও ড্যাশের জায়গায় অক্ষর সাজিয়ে সাজিয়ে পড়ছে: 'জাহাজ দুর্ঘটনায় পতিত হয়েছে।' তারপর আসছে নির্দেশ — কোথায় জাহাজ আছে।

বিন্দু ও ড্যাশ পরিণত হল শব্দে। শব্দগুলি সঙ্গে সঙ্গে পরিণত হল নির্দিষ্ট ধারণায়: জাহাজ, দুর্ঘটনা। এর পরে কাজ করে ভাবনা — তাড়াতাড়ি সাহায্যের জন্য যেতে হয়, ওখানে লোকজন আছে, তারা মারা যেতে পারে।

...ঢাকের আওয়াজ ওঠে। দ্রুত গুরগুর আওয়াজ। বিরতি। আবার দ্রুত গুরগুর আওয়াজ। আবার বিরতি। বিভিন্ন সময়ের অন্তর অন্তর গুরগুর আওয়াজ ও বিরতি। তারপর চলে থেকে থেকে ঢপঢপ ঘা, আবার গুরগুর আওয়াজ। পাশের গাঁ থেকে ভেসে আসা এই সঙ্কেত শুনতে পেয়ে একজন কেউ ঢাকের দিকে ছুটে যায়, সঙ্কেতটি পাঠিয়ে দেয় আরও দূরে, আবার কেউ কেউ অস্ত্রশস্ত্র তুলে নিয়ে যেখান থেকে আওয়াজ এসেছে সে দিকে রওনা দেয়। মেয়েরা ও ছোটরা ইতিমধ্যে বনে পালিয়ে যায়। ঢাকে সংবাদ এসেছে — শত্রু আমাদের আক্রমণ করেছে, দয়া করে সাহায্য করুন। ঢাকের আওয়াজ শব্দে রূপান্তরিত হয়, শব্দের পেছন পেছন এসে দাঁড়ায় ধারণা: শত্রু, লড়াই করতে হবে, অন্তত মেয়েদের আর ছোটদের বনে পালিয়ে যেতে হবে।

তারপর ঢাক নিয়ে আসে অন্য এক সমাচার — শত্রু পরাস্ত হয়েছে। যোদ্ধারা ঘরে ফিরে আসে, আর বন থেকে বেরিয়ে এসে মেয়েরা ও ছোটরা বিজয়ীদের অভ্যর্থনা জানানোর জন্য তৈরি হয়। ঐ ঢাকই তাদের বলে বিজয়ের কাহিনী। সুতরাং শব্দহীন মানবিক ভাষা অবশ্যই পরিণত হয় শব্দে, যার পেছনে থাকে নির্দিষ্ট ধারণা, কোন ভাবনা।

শব্দ ও অনুভূতি

ধ্বনি অথবা আন্দোলনের সাহায্যে মানুষ তার ভাবনা ছাড়াও নিজের অনুভূতি, নিজের অবস্থা প্রকাশ করতে পারে।

তোমরা হয়ত লক্ষ্য করে দেখেছ যে ছোট বাচ্চা খাটের মধ্যে হঠাৎ ছটফট করতে থাকে, ঘ্যান ঘ্যান করে কাঁদে, এমনকি চেঁচায়। সে এখনও কথা বলতে শেখে নি, শুধু তা-ই নয় — সে এখনও কিছুই বোঝে না। কিন্তু শুয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎই তার অস্বস্তি লাগে। তাই সে ছটফট করতে থাকে, কাঁদতে থাকে। সে কোন কিছু নিয়েই ভাবছে না। আসলে তার খারাপ লাগছে। কিন্তু যারা ভাবে, তাদের কাছে — মা-বাবা কিংবা ঠাকুমা-দিদিমা ও দাদুর কাছে, দাদা-দিদির কাছে — এ হল সঙ্কেত। এর মানে শিশুর কাছে যাওয়া দরকার, কিছু একটা করতে হয়।

আরও কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে।

কোন লোক হয়ত দৈবাৎ আঙুলে খোঁচা খেয়ে গেল। আকস্মিকতায় ও ব্যথায় সে চেঁচিয়ে উঠল। এবারেও, নিজের ব্যথার কথা ছেড়ে দিলেও, সে চেঁচিয়ে উঠল দৈবাৎ। কাউকে কিছু বলার ইচ্ছে তার ছিল না, নেহাৎই অমন ঘটে গেল — সে চেঁচিয়ে উঠল।

তুমি হয়ত ভাবতে ভাবতে অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছ, এমন সময় পাশে দড়াম করে দরজা বন্ধ হয়ে গেল। আকস্মিকতাবশত তুমি কেঁপে উঠলে কিংবা চেঁচালে। এবারেও দৈবাৎ — নিজের ইচ্ছায় নয়।

তোমার সঙ্গে দেখা হল এমন এক বন্ধুর, যার সঙ্গে দীর্ঘকাল দেখা-সাক্ষাৎ নেই। তোমার বড় আনন্দ হল। তুমি হয়ত চেঁচিয়ে বললে, 'কী খুশিই না হলাম!' তবে সম্ভবত তুমি প্রথমেই বলবে, 'ওঃ কোলিয়া!' বা এরকম একটা কিছু, আর তারপর যোগ করবে, 'কী খুশিই না হলাম!' কিংবা 'কোথা থেকে আসছিস?' ইত্যাদি। প্রথম বিস্ময়সূচক উক্তি 'ওঃ কোলিয়া!' তোমার মুখ থেকে আপনা-আপনি বেরিয়ে এলো কিছু না ভেবেই, নিজের ইচ্ছায় নয়, আনন্দের বশে।

অবশেষে আরও একটি দৃষ্টান্ত। বনের মধ্যে আচমকা তুমি দেখতে পেলে একটা বিষধর সাপ। এবারেও তোমার মুখ থেকে বেরিয়ে আসে একটা চিৎকার। তুমি হয়ত লাফ দিয়ে একপাশে সরে যাবে, তারপর তোমার পেছন পেছন যে আসছে তার উদ্দেশে চেঁচিয়ে বলবে, 'সাবধান, বিষাক্ত সাপ!'

এবারে দৃষ্টান্ত থেকে আসা যাক সিদ্ধান্তে।

মানুষ তার অনুভূতিকে প্রকাশ করতে পারে দু'ভাবে: প্রথমত, শব্দ দিয়ে — সেটা হবে সজ্ঞান প্রকাশ। দ্বিতীয়ত, চিৎকার, আন্দোলন, অঙ্গভঙ্গি, যেগুলি আসে অজ্ঞাতে — 'বেরিয়ে পড়ে'। এ হল অনিচ্ছাকৃত প্রকাশ।

আবার ইচ্ছাকৃত ও অনিচ্ছাকৃতের সম্মিলন হতে পারে। যেমন আঙুলে খোঁচা লাগা — তুমি যে কেবল চেঁচিয়েই উঠতে পার তা নয়, তোমার কেমন ব্যথা লেগেছে তাও বলতে পার।

বন্ধুর সঙ্গে দেখা হওয়ার সময় তুমি অনিচ্ছাকৃতভাবে চেঁচিয়ে ওঠ, 'ওঃ কোলিয়া!' সঙ্গে সঙ্গে একথাও বল যে দেখা পেয়ে খুশি হলে।

এই হল মানুষের আচরণ। এবারে দেখা যাক, জীব-জন্তুরা কেমন আচরণ করে।

প্রিয় প্রভুর দেখা পেয়ে কুকুর লেজ নাড়বে, লাফালাফি করবে, কুঁউ

কিঁউ করবে। তার সমস্ত আচরণ থেকে দেখা যায় যে সে খুব খুশি। কিন্তু লেজ নেড়ে, লাফ-ঝাঁপ দিয়ে কুকুর মোটেই বলতে চায় না, 'ওঃ, তুমি আসায় আমি কী খুশিই না হয়েছি!' সে মোটেই নিজের আনন্দ দেখাতে চেষ্টা করে না। কুকুর সে কথা ভাবে না। সে খুশি — এটাই সব!

জীব-জন্তুর যখন ব্যথা লাগে তখন তারা চেঁচায় বা চিঁচিঁ করে, সেই রকমই অনিচ্ছাকৃতভাবে যেমনভাবে তোমরা চেঁচাও আঘাত পেলে। কিন্তু তোমরা না-ও চেঁচাতে পার, তার বদলে কেবল বলতে পার, 'আমার ব্যথা করছে।' ব্যাপারটা তখন আর অনুভূতি নয় — ভাবনা। অর্থাৎ, ধ্বনি, আন্দোলন আর অঙ্গভঙ্গির সাহায্যে মানুষ কেবল নিজের অনুভূতিই প্রকাশ করে না, তার ভাবনাও প্রকাশ করে। কিন্তু জীব-জন্তু প্রকাশ করে কেবল অনুভূতি।

অনুভূতি, বোধের আরেক নাম হল আবেগ। এই কারণে জীব-জন্তুর সমস্ত আন্দোলন, আওয়াজ, অঙ্গভঙ্গি, অর্থাৎ তাদের যাবতীয় 'কথাবার্তার' নাম আবেগধর্মী ভাষা।

মানুষের ভাষার সঙ্গে জীব-জন্তুর ভাষার এখানেই প্রধান পার্থক্য, তবে একমাত্র পার্থক্য নয়।

মানুষ কদাচিৎ মনে মনে কথা বলে। সে যখন কথা বলে তখন বলে কারও উদ্দেশে কিংবা কোন কিছুর জন্য: সে জিজ্ঞেস করতে পারে, সংবাদ জানাতে পারে, ডাকতে পারে, সতর্ক করতে পারে। সে কথা বলে নিজের ভাবনা প্রকাশের জন্য কিংবা উত্তর পাওয়ার জন্য।

জীব-জন্তুরা কিন্তু মনে মনে কথা বলে। তারা নিজেদের অনুভূতি

'ব্যক্ত করে' মাত্র, 'কথোপকথনের সঙ্গীর' কাছে প্রকাশ করতে পারে না। কিন্তু অন্য জীব-জন্তুর কাছে, যারা তাদের সমগোত্রীয়কে দেখতে পায় অথবা শুনতে পায়, তাদের কাছে অনুভূতির এরকম প্রকাশ হল সংকেত — সংবাদ, সতর্কবাণী ইত্যাদি।

যেমন দুই কুকুরের মধ্যে দেখা হল — একটি বড়, আরেকটি তার চেয়ে ছোট। ছোট কুকুরটা সাবধানে এগিয়ে যায় — কে জানে বড় কুকুরটার মতলব কী? কিন্তু বড় কুকুরটা একটু খেলতে চায়, সাক্ষাতে সে খুশি। সে তার আনন্দ প্রকাশ করে লেজ নেড়ে। সে বলে না, 'তোমাকে দেখতে পেয়ে আমি খুশি!' সে কেবল লেজ নাড়ে, কেননা কুকুরের আনন্দ এভাবেই প্রকাশ পায়। ছোট কুকুরটা লেজ-নাড়া

দেখতে পায়, এতেই সে বুঝতে পারে যে আগন্তুককে ভয় পাওয়ার কিছু নেই। বলবান কুকুরটার মেজাজ ভালো না থাকলে দুর্বলের দূরে সরে থাকাই ভালো। দুর্বল কুকুরটা তার দাঁত খিঁচুনি আর ঘাড়ের খাড়া লোম দেখামাত্রই তা বুঝতে পারবে। এক্ষেত্রেও কুকুর বলে না, 'ভাগ, নইলে কামড়ে দেব কিন্তু।' কেবল অন্য কুকুরটির আবির্ভাব তার বিরক্তি অথবা ক্রোধ উদ্রেক করে। সংক্ষেপে বলতে গেলে ঘাড়ের খাড়া লোম, গড়গড় আওয়াজ, দাঁত খিঁচুনি — এ হল কোন এক অনুভূতির বাহ্য প্রকাশ। কিন্তু অন্য কুকুরটির কাছে বদ মেজাজের লক্ষণগুলি যে-কোন শব্দের চেয়ে স্পষ্ট অর্থবহ, আর এক্ষেত্রে যে কী রকম আচরণ করতে হবে তা সে বেশ ভালোই বুঝতে পারে।

আরও একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য: জীব-জন্তুরা নিজেদের ভাষার জ্ঞান নিয়েই জন্মায়। তাকে সেটা শিখতে হয় না। যেমন কুকুরছানা অন্যান্য কুকুরের সঙ্গ ছাড়া বেড়ে উঠলেও আজ হোক কাল হোক সে ঘেউ ঘেউ করতে, গর্‌গর্‌ করতে, লেজ নাড়তে কিংবা দাঁত খিঁচুতে শিখবেই শিখবে, যদিও কেউ তাকে তা শেখায় নি। অথচ মানুষ লোকজনের মাঝখানে বাস না করলে কথা বলতে শিখবে না।

তাহলে কী হবে, মানুষ তার মাতৃভাষা ছাড়াও আরও বহু ভাষা শিখতে পারে; জীব-জন্তুরা কিন্তু কখনই অন্যের ভাষায় কথা বলতে শিখবে না।

যে-সমস্ত পাখি অন্যদের গান, বিভিন্ন ধ্বনি এমনকি মানুষের কণ্ঠস্বর অনুকরণ করে তাদের সম্পর্কে বিশেষভাবে বলা যাবে।

আচ্ছা, এখন তোমরা ত জানতে পারলে জীব-জন্তুর ভাষা বলতে কী বুঝায়, তাহলে ভাষাগুলি কেমন ধরনের হয় আর সে সব ভাষায় জীব-জন্তুরা কী ভাবে কথাবার্তা বলে সেকথাও বলা যেতে পারে।

নামজাদা বিজ্ঞানীর যা জানা ছিল না

বিখ্যাত ফরাসী বিজ্ঞানী আঁরি ফাব্‌র সারা জীবন কীট-পতঙ্গ নিয়ে গবেষণা করেন। তিনি এমন বহু বিষয় জানতে পারেন যার কথা তখন পর্যন্ত কোন বইয়েও লেখা ছিল না, যার সম্পর্কে তখনও তিনি ছাড়া আর কেউই জানতেন না। ফাব্‌র সর্বদা ছয়পেয়েদের সান্নিধ্যে আসেন, তাদের জগতের আজব-আজব ঘটনা থেকে তিনি এই শিক্ষাই পান যে অবাক হওয়ার মতো কিছু নেই বললেই চলে। এবারে কিন্তু বিজ্ঞানী রীতিমতো তাজ্জব বনে গেলেন! এমন আর ঘটে নি!

সন্ধ্যার আগে আগে ফাব্‌র বারান্দায় একটা ছোট পরীক্ষা-জার রেখে দেন। সেখানে ছিল প্রজাপতির মূককীট। রাতে মূককীট থেকে প্রজাপতির জন্ম হল। ব্যাপারটাতে আশ্চর্যের কিছু ছিল না — ফাব্‌র এর আগে আরও কয়েকবার পরীক্ষা-জার-এ প্রজাপতি ফুটিয়েছেন। ফাব্‌র আশ্চর্য হলেন অন্য একটি ব্যাপারে: সকালবেলায় দেখা গেল কোথা থেকে যেন নতুন-নতুন প্রজাপতি উড়ে এসে গোটা বারান্দা ছেয়ে ফেলেছে। বারান্দার রেলিং-এ, টেবিলে, টাঙানো দড়িতে, চেয়ারের পিঠে — সর্বত্র তারা বসে ছিল। আর যেখানে সদ্যোজাত প্রজাপতিটি ছিল সেই ছোট পরীক্ষা-জারটি আগাগোড়া ঢাকা পড়ে গিয়েছিল রাতের আগন্তুকদের ভিড়ে।

ফাব্‌র প্রজাপতি ধরার জাল হাতে নিলেন, দেখতে দেখতে শ' খানেক প্রজাপতি জারগুলিতে এসে জমা হল। ফাব্‌র তখন দেখতে পেলেন যে ধৃত প্রজাপতিদের সবগুলিই পুং-প্রজাপতি। বিজ্ঞানী তাড়াতাড়ি সদ্যোজাত প্রজাপতি সমেত পরীক্ষা-জারটি নিলেন। ঠিকই ত — পরীক্ষা-জার-এ যেটি আছে সেটি হল স্ত্রী-প্রজাপতি।

ফাব্‌র জানতেন যে এই প্রজাপতিদের পুং-জাতিরা স্ত্রী-জাতিদের দু একদিন আগে জন্মায়; তিনি এও জানতেন যে গুটি থেকে বেরিয়ে

আসার পর প্রজাপতি এক বিন্দু তরল পদার্থ নিঃসরণ করে। এই ত সেই এক বিন্দু তরল পদার্থ — পরীক্ষা-জার-এর তলদেশে শুকিয়ে আছে। ফাব্‌র এমনও আন্দাজ করতে পারলেন যে এই তরল পদার্থের ঘ্রাণ পুং-প্রজাপতিদের আকর্ষণ করে। কিন্তু...

যুক্তি দিয়ে বিচার-বিবেচনা করে ফাব্‌র অনিবার্যভাবে যে-সিদ্ধান্তে আসতে বাধ্য হলেন তা হল এই যে বারান্দায় রাতের আগন্তুকদের আগমনে প্রবৃত্ত করেছে পরীক্ষা-জার-এ প্রজাপতির আবির্ভাব — আরও স্পষ্ট করে বলতে গেলে, তরল পদার্থের আবির্ভাব। এই ভাবনায় উপনীত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ফাব্‌রের পক্ষে দরকার হয়ে পড়ল আরও একটি প্রশ্নের উত্তর: এই অসংখ্য প্রজাপতির দল কোথা থেকে উড়ে এলো? — সবচেয়ে কাছের যে বন তাও ত বাড়ি থেকে দুই-তিন কিলোমিটার দূরে! স্ত্রী-প্রজাপতির আবির্ভাবের কথা ওরা জানলই বা কী করে? গন্ধ পেয়ে? দুই-তিন কিলোমিটার দূর থেকে তরল পদার্থের গন্ধ পেয়ে? অসম্ভব!

না, ফাব্‌র কিন্তু পোকা-মাকড় নিয়ে ভালোমতোই গবেষণা করেছেন! তিনি ছিলেন বিগত শতাব্দীর ফ্রান্সের অন্যতম বিশিষ্ট বিজ্ঞানী। তাহলেও তখনও অনেক কিছু জানা তাঁর বাকি ছিল। পোকা-মাকড়ের অত্যন্ত কৌতূহলজনক একটি ধর্মও ফাব্‌র-এর জানা ছিল না — তিনি জানতেন না তাদের অসাধারণ ঘ্রাণশক্তির কথা।

তবে এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই: সে সময় ছয়পেয়েদের ঘ্রাণশক্তি নিয়ে বিজ্ঞানীরা কমই গবেষণা করেন, যদিও তাঁরা বুঝতে পেরেছিলেন যে ঘ্রাণশক্তি — ঘ্রাণ উপলব্ধির ক্ষমতা — জীব-জন্তুদের জীবনে একটা বেশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। গন্ধ শুঁকে হিংস্র জীব-জন্তুরা অন্ধকারের মধ্যেও তাদের ভবিষ্যৎ শিকারের চিহ্ন খুঁজে পায়; গন্ধ শুঁকে বহু জীব-জন্তু বিপদ টের পায়। অন্ধকারে, মাটির নীচে, গাছের কোটরে, জলের নীচে — সর্বত্রই, যেখানে দৃষ্টিশক্তি অথবা শ্রবণশক্তি কাজে আসে না সেখানে সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসে ঘ্রাণশক্তি।

খেঁকশিয়ালী

মানুষের জীবনে ঘ্রাণশক্তি তেমন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে না, যেহেতু তাকে গন্ধ শুঁকে খাবার খুঁজে বার করতে হয় না কিংবা শত্রুর অস্তিত্ব জানতে হয় না। মানুষ তাই মাত্র কয়েক হাজার গন্ধ অনুভব করতে পারে এবং তাদের পার্থক্য বুঝতে পারে। তোমাদের হয়ত মনে হতে পারে যে কয়েক হাজার — সে ত অনেক! কিন্তু যদি দৃষ্টান্তস্বরূপ বিবেচনা করে দেখা যায় যে কুকুর বিশ লক্ষ অবধি ধরনের গন্ধের পার্থক্য অনুভব করতে পারে, তাহলেই বুঝতে পারবে যে মানুষের নাক তেমন একটা অনুভূতিপ্রবণ নয়।

কুকুরের ঘ্রাণেন্দ্রিয় চমৎকার, তায় আবার সে ভালো দেখতে পায়, শুনতে পায় আরও ভালো।

'ইঁদুরখেকো' খেঁকশিয়ালীর কাছে, অর্থাৎ যে-সমস্ত খেঁকশিয়ালী ইঁদুর শিকার করে, তাদের কাছে ঘ্রাণশক্তি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, তবে তার চেয়েও বেশি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষীণ দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন ও জবুথবু প্রাণী কাঁটাচুয়ার কাছে। গন্ধ শুঁকে খাদ্যোপোযোগী পোকা-মাকড় খুঁজে বার করতে না পারলে তাবৎ কাঁটাচুয়া বহুকাল আগে না খেতে পেয়ে ফৌত হয়ে যেত। কাঁটাচুয়াদের যদি দশ মিটার দূর থেকে গন্ধ শুঁকে শত্রুর অস্তিত্ব টের পাওয়ার ক্ষমতা না থাকত, তাহলে অনেক কাল আগেই পৃথিবীতে একটিও কাঁটাচুয়া থাকত না।

মৌমাছি, প্রজাপতি, গুবরে পোকা দূর থেকে অনুভব করতে পারে কোথায় মিষ্টি রস কিংবা গাছের রস আছে; মশা ও ডাঁশ-মশারা বহু দূর থেকে মানুষের কিংবা জীব-জন্তুর নিশ্বাস-পরিত্যক্ত কার্বন-ডাইঅক্সাইডের গন্ধ টের পেয়ে রক্ত পানের উদ্দেশ্যে সেই গন্ধের দিকে ছুটে যায়। বিজ্ঞানে আজও অজ্ঞাত, রহস্যময় যে-বস্তু ত্বকের অভ্যন্তর থেকে বাষ্পাকারে নিঃসৃত হয়, সেই 'রক্তোপাদান'ও তাদের আকর্ষণ করে।

আর যে-সব পোকা-মাকড় প্রায় সারা জীবন মাটির মধ্যে কাটায় তাদের ঘ্রাণশক্তি এত প্রখর যে কোন বস্তু হঠাৎ তাদের সামনে উপস্থিত হলে ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের সাহায্যে তারা তা নির্ধারণ করতে ত পারেই, এমনকি তার আকৃতি ও আয়তনও নির্ধারণ করতে পারে।

আঁরি ফাব্র অবশ্যই জানতেন যে জীব-জন্তুর জীবনে, বিশেষত কীট-পতঙ্গের জীবনে ঘ্রাণের তাৎপর্য বিরাট। তিনি নিজে বহু সংখ্যক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন। কিন্তু তাঁর পক্ষেও ধারণা করা সম্ভব ছিল না তাদের ঘ্রাণশক্তি কত প্রখর।

কেবল পরবর্তীকালেই বিজ্ঞানীরা তা বুঝতে পারলেন এবং স্ত্রী-প্রজাপতি যে গন্ধযুক্ত পদার্থ নিঃসরণ করে, যা পুং-প্রজাপতিদের এতটা আকর্ষণ করে তাই বা কী সে ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হলেন। কিন্তু পদার্থ বিশ্লেষণ করতে গেলে তা পাওয়া চাই। এক গ্রাম গন্ধযুক্ত দ্রব্য পেতে গেলে তা 'নিতে হয়' তুত-রেশমকীটবর্গের চল্লিশ লক্ষ প্রজাপতির কাছ থেকে।

বিজোড় রেশমকীট তুত-রেশমকীটের তুলনায় গন্ধযুক্ত পদার্থ বেশি দিয়ে থাকে: এক গ্রাম পেতে লাগে ২৫ লক্ষ প্রজাপতি।

তাহলে একটা প্রজাপতির কত আছে? নগণ্য পরিমাণ! কিন্তু মাঝামাঝি মাত্রায় বায়ু থাকলে বিজোড় রেশমকীটের পুং-প্রজাপতিরা কয়েক হাজার মিটার দূর থেকে — আরও সঠিকভাবে বলতে গেলে ৩·৮ কিলোমিটার দূর থেকে এই নগণ্য পরিমাণের অস্তিত্ব অনুভব করে।

পরন্তু বাইরের কোন ঘ্রাণ তাদের প্রয়োজনীয় ঘ্রাণ উপলব্ধির অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায় না।

একদিন ঘরে রাখা পরীক্ষা-জার-এ মূককীট থেকে বের হল ময়ূর নেত্রচিহ্নিত বিশাল এক নিশাচর প্রজাপতি। সেই মুহূর্তে এসে হাজির হল পুং-প্রজাপতির দল। তারা খোলা জানলা ভেদ করে উড়ে আসে, পরীক্ষা-জার-এর উপর এসে বসে, টেবিলের ওপর দৌড়াদৌড়ি করে, বাতির চারধারে ঘুরতে থাকে। দেখতে দেখতে বিশাল বিশাল প্রজাপতির দলে প্রায় গোটা ঘর ছেয়ে গেল। জানলাগুলি বন্ধ করে দিতে হল, কিন্তু প্রজাপতিরা আসছে ত আসছেই — দেখা গেল তারা ঘরে ঢুকছে পুরনো

কাঁটাচুয়া

চুল্লীর চিমনীর ভেতর দিয়ে। শেষকালে ঘরে এসে জমা হল ১২৫টি প্রজাপতি। অথচ ময়ূর নেত্রচিহ্নিত বিশাল নিশাচর প্রজাপতি এমনই যে তাদের কদাচিৎ চোখে পড়ে। তাহলে কোথা থেকে এলো ১২৫টি? দেখা যাচ্ছে স্ত্রী-প্রজাপতির গন্ধ টের পেয়ে দূর দূর অঞ্চল থেকে পর্যন্ত দলে দলে প্রজাপতি ৮ কিলোমিটার দূরত্ব পেরিয়ে এসে উপস্থিত হয়েছে।

সম্প্রতি বিজ্ঞানীরা যে পরীক্ষাটি করেন সেটা এই রকমের: তাঁরা চক্করওয়ালা পুং-প্রজাপতিদের চিহ্নিত করে চলন্ত ট্রেনের জানলা দিয়ে ছাড়তে থাকেন। ৪·১ কিলোমিটার দূরত্ব থেকে মোটা ছিদ্রযুক্ত কাপড়ে ঢাকা পরীক্ষা-জার-এ অবস্থিত স্ত্রী-প্রজাপতির কাছে প্রায় অর্ধেক সংখ্যক প্রজাপতি ফিরে আসে, আর ১১ কিলোমিটার দূরত্ব থেকে — ছেড়ে দেওয়া সমস্ত পুং-প্রজাপতির এক-চতুর্থাংশেরও বেশি।

বিজোড় রেশমকীট

তুত-রেশমকীট

কিন্তু পুং-প্রজাপতিরা ত আর সব সময় স্ত্রী-প্রজাপতিদের কাছে উড়ে আসে না, তারা আসে একটা বিশেষ সময়ে — যখন গন্ধযুক্ত পদার্থ নিঃসৃত হয়। তা প্রজাপতিদের পথও দেখায়। গন্ধযুক্ত পদার্থের সাহায্যে স্ত্রী-প্রজাপতি অনেকটা যেন পুং-প্রজাপতিকে উড়ে আসার নির্দেশ দেয়। নির্দেশ শব্দ দিয়ে গঠিত, না ধ্বনি দিয়ে গঠিত সেটা বড় কথা নয় — এই নির্দেশ বিশেষ গন্ধের সাহায্যে প্রকাশ পায়। আর তা তামিল করতেই হবে।

বিজ্ঞানীরা এখন জানেন যে ঘ্রাণের কল্যাণে কীট-পতঙ্গ কেবল যে 'নির্দেশই দিতে পারে' তা নয়, তারা একে অন্যকে সংবাদ জানাতে পারে, বিপদ সম্পর্কে সচেতন করে দিতে পারে, এমনকি সমাগম স্থির করতে পারে। মোট কথা, পরস্পর কথাবার্তা বলতে পারে। এ ধরনের কথাবার্তাকে বিজ্ঞানীরা নাম দিয়েছেন 'ঘ্রাণের ভাষা'।

ভ্রমর ও ভাল্লুক নিজেদের কথা জানায়

এক দল প্রজাপতি সংকেত-নির্দেশ পাঠায়, অন্যেরা তাদের বড় বড় অ্যানটেনা-শুঙ্গের সাহায্যে সে নির্দেশ গ্রহণ করে এবং তৎক্ষণাৎ পালন করে। ব্যাপারটা হয় অনেকটা বিনা-তারে টেলিগ্রাফের মতো।

ভ্রমর

আবার ভ্রমরের কান্ডটা দেখ — সে কিন্তু টেলিগ্রাম পাঠায় না — চিঠি লেখে। বিশ্বাস না হয় বসন্তকালে কোন এক সময় ভ্রমরের গতিবিধি লক্ষ্য করে দেখ।

এই ত ভ্রমর — গোব্দাগোব্দা, ঝোপড়া, কেমন যেন থপথপে — ধীরেসুস্থে গাছের দিকে উড়ে এলো। ভ্রমরের আচরণটা আজ কেমন যেন অদ্ভুত: কখনও গাছের ছালের এ জায়গা স্পর্শ করছে, কখনও বা ও জায়গা। তারপর উড়ে যাচ্ছে অন্য এক গাছে, সেখানেও ছালের নানা জায়গা স্পর্শ করছে কিংবা পাতা ও ডালপালায় কামড় দিচ্ছে, আবার উড়ে বসছে অন্য এক গাছে। একের পর এক চার, পাঁচ, ছয়... কিন্তু ভ্রমর যে এক গাছ থেকে আরেক গাছে উড়ে চলেছে তা সোজাসুজি নয় — সে বড় বড় বৃত্ত এঁকে চলেছে। শেষ পর্যন্ত ফিরে আসে প্রথম গাছটাতে। তখন সব কিছু শুরু হয় গোড়া থেকে। খিদে পেয়ে গেলে ভ্রমর অল্পক্ষণের জন্য উড়ে চলে যায়, তারপর আবার চালিয়ে যায় সেই অদ্ভুত ওড়া।

লোকে বহুকাল অবধি বুঝতে পারত না ভ্রমরদের ব্যাপারটা কী। অবশেষে কয়েক বছর আগে বিজ্ঞানীরা এই পতঙ্গদের গোপন রহস্য উদ্ঘাটন করেন: দেখা যাচ্ছে ভ্রমরেরা ভ্রমরীদের উদ্দেশে 'চিঠি লেখে'। তাদের কলম বা পেন্সিল না থাকাটা দুর্ভাগ্যের নয়, ওসব না থাকলেও তাদের আছে চোয়াল। আর চোয়ালের মূলদেশে আছে ক্ষুদ্র গ্রন্থি যা ভ্রমরের কাছে কালির স্থান নেয়। এটা অবশ্য ঠিক যে এই ক্ষুদ্র গ্রন্থি রং উৎপাদন করে না, উৎপাদন করে উগ্র গন্ধযুক্ত পদার্থ। কিন্তু তা পুরোপুরি কালির কাজ করে, যেমন চোয়াল দিব্যি ভ্রমরের কলমের কাজ করে। গাছের ছাল স্পর্শ করে, পাতা আর ডালপালায় কামড় দেওয়ার সময় ভ্রমর তার গন্ধযুক্ত চিঠি রেখে যায়। কিন্তু একটা গাছ বা ঝোপ তার পক্ষে যথেষ্ট নয় — সে আরও এক গাছে উড়ে যায় এবং সেখানেও সেই একই কাজ করে, তারপর আরেকটিতে, আরও একটিতে ইত্যাদি। অতঃপর দেয় দ্বিতীয় চক্কর, আরেকটি এবং আরও... এই ভাবে সে একেবারে সন্ধ্যা অবধি পাক খেতে পারে। তবে প্রায়ই এমন ঘটে যে ভ্রমরকে দীর্ঘকাল উড়তে হয় না — কোন একটি গাছে সে তারই মতো গোব্দাগোব্দা এক ভ্রমরীর দেখা পেয়ে যায়। ভ্রমরী ততক্ষণে চিঠি 'পড়ে ফেলেছে', সে ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করছে কখন সেই লোমশ প্রিয়দর্শী উড়ে এসে গাছে বসবে।

ভ্রমর যার উদ্দেশে চিঠি লিখেছে তার কাছে সেটি পেঁছে গেছে। যাতে গুলিয়ে না যায়, যার জন্য লেখা হয়েছে কেবল সে-ই যাতে চিঠি পায় সেই উদ্দেশ্যে বিভিন্ন ধরনের ভ্রমর বিভিন্ন যাত্রাপথের আশ্রয় নেয়। কেউ কেউ গাছের গুঁড়ির গায়, মাটির একেবারে কাছাকাছি জায়গায় তাদের চিঠি রেখে যায়, কেউ কেউ গাছের পাতায় তাদের চিহ্ন রাখে, কেউ বা ঝোপঝাড়ই ভালো বিবেচনা করে, আবার আরেক দল কেবল ঘাসের ওপর তাদের বারতা রেখে যায়।

ভ্রমরেরা 'লিরিকধর্মী' চিঠি লেখে। কিন্তু বহু জীব-জন্তু অদৃশ্য

শত্রুদের উদ্দেশে হুমকি দিয়ে বার্তা রেখে যায়।

একবার আমি এক অভিজ্ঞ শিকারীর সঙ্গে তাইগায় বেড়াচ্ছিলাম। হঠাৎ সে একটা গাছের সামনে থমকে দাঁড়াল, আমাকে দেখাল গাছের বাকলের ওপর গভীর আঁচড়। আঁচড় ছিল ওপরের দিকে, মানুষের মাথার চেয়ে অনেক ওপরে।

'তাইগার কর্তা চিঠি লিখে রেখেছে', সে বলল, 'যদি চাও ত পড়ি!'

'চাই বৈ কি।'

'এই জায়গাটা দখলে আছে', আঁচড়ের দিকে তাকিয়ে পড়ার মতো ভঙ্গি করে শিকারী শুরু করল, 'আর সব ভালুকের এখানে প্রবেশ নিষেধ। অন্যথায় খারাপ হবে! দেখতে পাচ্ছ আমি কত বড়?'

'ঠিকই, ত — বিশাল ভালুক', চিহ্নটার দিকে তাকিয়ে আমি বললাম।

'বড় ঠিকই, তবে ভয় পাওয়ার মতো প্রকাণ্ড নয়, ভালুক বাবাজী চালাকি খাটিয়েছে। চিহ্নটা বেশ উঁচুতে দিয়ে অন্যান্য ভালুককে যাতে বেশ ভড়কে দেওয়া যায় তার জন্য সর্বশক্তিতে টান টান হয়ে দাঁড়িয়েছে। ওদের ধারাই এরকম। ভালুকেরা আবহমানকাল ধরে একে অন্যকে ঠকিয়ে আসছে...'

এই ভালুকমার্কা চালাকি আমার বেশ লাগল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আমি ভাবলাম: 'আচ্ছা, এই আঁচড়কাটা চিহ্ন যে তাদের কোন স্বজন রেখে গেছে এটা ভালুকেরা বোঝে কী করে? কত রকম ভাবেই ত গাছে এমন আঁচড় দেখা দিতে পারে।' আমি যখন শিকারীকে নিজের সন্দেহের কথা বললাম তখন সে কেবল মৃদু হেসে ঐ গুঁড়িটাই দেখিয়ে দিল। মনোযোগ দিয়ে তাকাতে বাকলের ওপর আমি লোম দেখতে পেলাম। শিকারী ব্যাখ্যা করে বলল যে ভালুক কেবল চিহ্নই করে রাখে না — সে তার গন্ধও রেখে যায়। তার কোন 'আত্মীয়' সেখানে এলে সে-গন্ধ অবশ্যই টের পাবে। গন্ধ থেকে সে জানতে পারবে যে জায়গাটা দখলে আছে, চিহ্ন থেকে জানা যাবে জায়গার মালিকের আকৃতি কেমন। ভালুক তার গন্ধ রেখে যায় গুঁড়িতে পিঠ অথবা মাথা ঘষে ঘষে।

বহু জীব-জন্তু এ ধরনের চিঠি, চিরকুট ও বিজ্ঞপ্তি রাখে। কেউ কেউ, যেমন ভালুক, গাছ ও পাথরের গায় নেহাৎ পিঠ ঘষে, কারও কারও আছে বিশেষ ধরনের নিঃসরণ গ্রন্থি।

ভালুক

কৌতূহলজনক এই যে নিঃসরণ গ্রন্থিগুলি কখনও কখনও বড় অদ্ভুত অদ্ভুত জায়গায় দেখা যায়: ভ্রমরের — তোমাদের এখন আর জানতে বাকি নেই — থাকে চোয়ালের গোড়ায়, আবার কোন কোন জাতের হরিণের থাকে চোখের কোনায়। এ ধরনের হরিণ নিজের জমির সীমানায় নিঃসরণ গ্রন্থির সাহায্যে ডালপালার ডগা স্পর্শ করে গন্ধযুক্ত চিঠি রেখে যায়। কোন কোন প্রাণীর নিঃসরণ গ্রন্থি থাকে পায়ে কিংবা পাঁজরের দু'পাশে, ঠোঁটে কিংবা পিঠে — এমন সমস্ত জায়গায় যা দিয়ে জীব-জন্তুরা সচরাচর ঘাস কিংবা গাছপালা স্পর্শ করে।

আবার এই দেখ না কেন, কোন কোন জাতের লেমুরের বিশেষ গ্রন্থি থাকে প্রায় বগলের নীচে। বোঝ কাণ্ড! নিঃসরণ গ্রন্থি যদি এমন জায়গায় থাকে যা দিয়ে সে কোন বস্তুই স্পর্শ করে না, তাহলে বেচারির চিঠি রাখার উপায় কী? লেমুর কিন্তু একটা উপায় বার করেছে — সে লেজের ডগা নিঃসরণ গ্রন্থিতে ঘষে, তারপর লেজের সাহায্যে 'স্বাক্ষর করে'।

লেমুর

বেশ কিছু প্রাণী চিঠি ও চিরকুটের সাহায্যে কথাবার্তা বলে। সেগুলি প্রায় সর্বদাই হয় 'লিরিকধর্মী বারতা' নয়ত সতর্কবাণী: 'ভাগ বলছি, এটা আমার জায়গা! না সরলে ধোলাই খাবি!' আমেরিকার ক্ষুদ্রকায় জন্তু স্কুন্‌ক কিন্তু কাউকে মারধোর দেওয়ার মধ্যে নেই। তবে তার চিঠি বেশ জোরদার এবং শত্রুদের উপর ধোলাই দেওয়ার হুমকির চেয়ে কম কার্যকরী হয় না।

স্কুন্‌ক

স্কুন্‌কের না আছে শক্তিশালী নখর, না আছে জোরাল চোয়াল। তা সত্ত্বেও তার পেছনে বিশেষ কেউ লাগতে চায় না। বিপদ দেখলে স্কুন্‌ক তীব্র গন্ধযুক্ত ঝাঁঝাল তরল পদার্থের ধারা ছাড়ে। এই তরল পদার্থের গন্ধ দীর্ঘস্থায়ী: লোকে শরীর রীতিমতো ধুয়েও দীর্ঘকাল তা থেকে রেহাই পায় না। জীব-জন্তুরা এই প্রাণীর আচরণ ভালোমতো জানে, তাই তারা তাকে এড়িয়ে চলার চেষ্টা করে।

নিজের অধিকারভুক্ত জায়গায় ঘুরে ঘুরে 'চিঠি' লিখে স্কুন্ক যেন এই বলে সাবধান করে দেয়: 'সরে যাও, নইলে খারাপ হবে — আমি তোমাদের গায় এরকম জলো জিনিস ঢেলে দেব কিন্তু।'

এই ভাবে জীব-জন্তুরা 'চিঠি চালাচালি করে'। আর তারা একে অপরকে দিব্যি বুঝতেও পারে।

মৌমাছি

'আমার পিছু পিছু এসো! পস্তাতে হবে না!'

মৌমাছিদের সঙ্গে মানুষের বহুকালের পরিচয়। সম্ভবত আদিম মানুষ পর্যন্ত গাছপালার কোটরে বুনো মৌমাছিদের বাসা খুঁজে বার করে তারিয়ে তারিয়ে মধু খেত। কয়েক হাজার বছর আগে লোকে মৌমাছির গার্হস্থ্য ব্যবহার শুরু করে: মৌচাক নির্মাণ করতে থাকে, এই পতঙ্গদের প্রায় গৃহপালিত প্রাণীতে পরিণত করে ফেলে। প্রাচীনকালে রাশিয়ায় মৌপালনকারীদের বলা হত মৌচাষী। তারা যেমন চাক বানাত তেমনি জঙ্গল থেকে বুনো মৌমাছিদের মধুও সংগ্রহ করত। কোথায় বাসা খুঁজে পাওয়া যেতে পারে, কোন ধরনের ঝাঁক বাড়িতে নিয়ে আসা যায়, মধু কখন সংগ্রহ করা উচিত, কী ভাবে ঠাণ্ডা আর খাদ্যাভাব থেকে মৌমাছিদের সযত্নে ঠেকিয়ে রাখা যায় — এসব তথ্য অভিজ্ঞ মৌচাষীরা ভালোই জানত। কিন্তু মৌমাছিরা কী ভাবে মধু সংগ্রহ করে এ নিয়ে তারা মোটেই মাথা ঘামাত না। কী ভাবে? আরে, এটা ত স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে: ফুলে ফুলে উড়ে বেড়ায়, মিষ্টি সুধা সংগ্রহ করে, আর তা থেকেই পাওয়া যায় মধু।

হ্যাঁ, এটা অবশ্য ঠিকই। তবে এখানেই ওঠে অসংখ্য প্রশ্ন। এই যেমন প্রশ্ন উঠতে পারে: এক কিলো মধু সংগ্রহ করতে গেলে মৌমাছিদের কতটা কাজ করতে [illegible] না, কথায় ত বলে মৌমাছির মতো পরিশ্রমী। কিন্তু মৌমাছির সত্যিকারের শ্রমশীলতা সম্পর্কে ক'জনেরই বা ধারণা আছে? এক কিলোগ্রাম মধু পেতে গেলে মৌমাছিকে ১ কোটি ৯০ লক্ষ ফুল থেকে সুধা সংগ্রহ করতে হয়। বলাই বাহুল্য যে একটি মৌমাছির পক্ষে অতগুলি ফুলে ঘুরে ঘুরে ওড়া সম্ভব নয়: এক কিলোগ্রাম মধু সংগ্রহ করে অনেকগুলি মৌমাছি, তবে তাই বলে একজনের কাজও কম নয়: শ্রমিক মৌমাছি এক দিনে গড়ে সাত হাজার ফুলে ঘোরে!

এই ফুলগুলি আবার খুঁজেও বার করতে হয়!

সৌভাগ্যবশত, কোথায় খাদ্য আছে, সে খাদ্য কতটা, এমনকি কেমন — মৌমাছিরা তা পরস্পরকে জানাতে পারে।

মৌমাছিরা নানাভাবে কথাবার্তা চালাতে পারে। তারা ঘ্রাণের ভাষায়ও কথা বলে।

গুপ্ত-সন্ধানী মৌমাছি মৌচাকে এলো, সে তার শিকারের সঙ্গে সঙ্গে নিয়ে এলো ফুলের গন্ধ। ফুলের গন্ধ হলেই কিন্তু হল না, যে-সমস্ত ফুল

থেকে শিকার আহরণ করা হয়েছে তাদের গন্ধ চাই। মৌমাছিরা অবশ্য ফুলের নাম জানে না, তারা অবশ্যই শব্দের সাহায্যে বলতে পারে না: 'এই যে এ ফুলগুলিতে মধু আছে।' তবে মৌমাছির মুখের থলিতে সামান্য পরিমাণ ফুলের মধু আছে। মৌচাকে আসার পর সে থেকে থেকে তা নিঃসরণ করে।

ফুলের মধুর গন্ধে বাদবাকিরা জানতে পারে তাদের বন্ধুটি কোথায় ছিল।

তাছাড়া অন্যান্য বস্তু কিংবা অন্যান্য কীট-পতঙ্গের দেহের তুলনায় মৌমাছির দেহে ফুলের মৃদু ও কমনীয় ঘ্রাণ বেশি সময় ধরে লেগে থাকে।

এই ভাবে গুপ্ত-সন্ধানী মৌমাছি তার বন্ধুদের জানিয়ে দিল কোন ধরনের ফুলে শিকার আছে। জানাল ঘ্রাণের ভাষায়।

অন্যান্য ভাষার সাহায্যে সে বন্ধুদের বলে শিকার কতটা আছে এবং কোথায় আছে (মৌমাছিদের এই কথাবার্তা সম্পর্কে তোমরা পরে জানতে পারবে)।

কিন্তু মৌচাকে ফুলের গন্ধ মৌমাছিরা কেবল তখনই আনতে পারে যখন উদ্ভিদের গায় সেই গন্ধ থাকে। অথচ এমন ফুলও ত কম নেই যেগুলি গন্ধহীন। হ্যাঁ, ফুলে গন্ধ না থাকলেও সে ফুল থেকে বড় রকমের শিকার পাওয়া যেতে পারে। তাহলে কী উপায়? মৌমাছিরা কি তাই বলে সে ফুল ছেড়ে দেয়? না, এই সব ফুল সম্পর্কে পরস্পরকে জানানোর জন্য মৌমাছিদের অন্য উপায় আছে।

মৌমাছির গঠনপ্রকৃতি মানুষ অনেক কাল আগেই গবেষণা করে জানতে পেরেছে। মনে হতে পারে, যাবতীয় খুঁটিনাটি জানতে পেরেছে। তথাপি কয়েক দশক আগে মৌমাছির তলপেটের শেষ দিকে এমন এক গ্রন্থির সন্ধান পাওয়া যায় যা আগে বিজ্ঞানীদের অজানা ছিল। এই গ্রন্থি গন্ধযুক্ত তরল পদার্থ উৎপাদন করে। কিন্তু সর্বদা উৎপাদন করে না, করে কেবল তখনই যখন কোন কিছু 'চিহ্নিত করা' আবশ্যক হয়ে পড়ে। যেমন, বসন্তকালে মৌমাছিরা তাদের গন্ধের সাহায্যে মৌচাক 'চিহ্নিত করে' রাখে। গন্ধ দীর্ঘস্থায়ী, বেশ দীর্ঘ সময় ধরে মৌচাকের কাছাকাছি থেকে যায় এবং মৌমাছিরা ঘরে ফেরার সময় চমৎকার আলোকস্তম্ভের মতো কাজ দেয়।
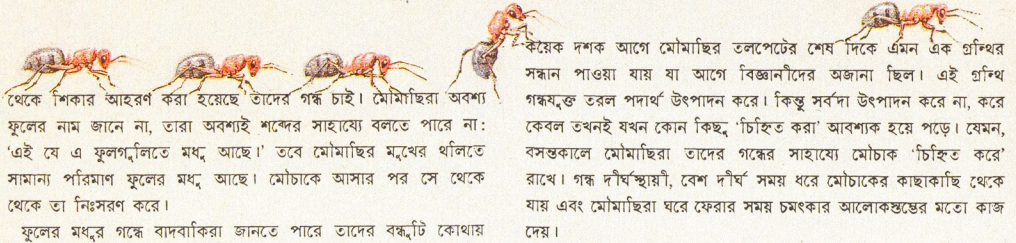
বিজ্ঞানীরা এর নাম দিয়েছেন 'আকর্ষণী ঘ্রাণ'। এই গন্ধের সাহায্যেই গুপ্ত-সন্ধানী মৌমাছিরা বিশেষ বিশেষ ফুলকেও চিহ্নিত করে। এই গন্ধ যেন মৌমাছিদের বলে দেয়: 'পাশ কাটিয়ে চলে যেও না!'

কোন কোন মৌমাছির ভ্রমরের মতোই বিশেষ ক্ষুদ্র গ্রন্থি আছে চোয়ালের গোড়ায়। সেই গ্রন্থিও গন্ধযুক্ত তরল পদার্থ নিঃসরণ করে। গুপ্ত-সন্ধানী মৌমাছি সময় সময় চোয়াল দিয়ে ঘাসের ডগা, ডালপালা ও পাতা স্পর্শ করে খাদ্য কোন পথে গেলে পাওয়া যায় তার নির্দেশ দেয় এবং গন্ধযুক্ত চিহ্ন রেখে যায়।

প্রসঙ্গত, ভ্রমরেরা কেবল 'লিরিকধর্মী বারতাই' রাখে না — তারা পুরোপুরি 'কাজের চিঠিও' লেখে: বাসা থেকে উড়ে বাইরে গিয়ে তারা এমন সমস্ত জায়গায় খোঁজ করে যেখানে খাদ্য আছে এবং গাছগাছড়ার উপর বিন্দু বিন্দু গন্ধযুক্ত পদার্থ ফেলে খাদ্যের দিকে পথ চিহ্নিত করে।

মৌমাছিদের মতো পিঁপড়েরাও সামাজিক কীট। তাদেরও নিয়মকানুন আছে: কেউ একজন খাদ্যের সন্ধান পেলে অবিলম্বে সে সংবাদ বন্ধুবান্ধবদের জানায় এবং তাদের সঙ্গে করে শিকারের কাছে নিয়ে যায়।

মৌমাছিদের মতো পিঁপড়েদেরও তলপেটে আছে গন্ধযুক্ত পদার্থ

নিঃসরণকারী বিশেষ গ্রন্থি। পিঁপড়ের ঢিবি একবার পারলে লক্ষ্য করে দেখ। একটা পিঁপড়ে হয়ত নিশ্চিন্ত মনে ছুটে চলছে। তার মানে, ছুটছে অমনি অমনি। আবার দেখ, আরেকটির চলাফেরা অদ্ভুত — প্রতি মিনিটে যেন একটু করে বসছে।

একটু মনোযোগ দিয়ে তাকালেই দেখতে পাবে যে সে থেকে থেকে মাটিতে তলপেট ঠেকাচ্ছে। এই ভাবে সে গন্ধযুক্ত তরল পদার্থের সাহায্যে পথ চিহ্নিত করে রাখছে। তার মানে সে কিছু একটার সন্ধান পেয়েছে এবং শিগগিরই দলবল নিয়ে সেখানে ফিরে যাবে — মনে হয় একার পক্ষে শিকার বয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। সন্ধানপ্রাপ্ত দ্রব্যের পথ যাতে খুঁজে পাওয়া যায় সেই উদ্দেশ্যে পিঁপড়ে গন্ধযুক্ত চিহ্ন রেখে যাচ্ছে।

একবার পিঁপড়েদের নিরীক্ষণ করার সময় আমি পিঁপড়ের ঢিবির সামান্য দূরে একটা বিরাট শুঁয়োপোকা রেখে দিলাম।

কিছুক্ষণের মধ্যে গুপ্ত-সন্ধানী পিঁপড়ে সেখানে এসে হাজির।

শুঁড় দিয়ে শুঁয়োপোকাটাকে তাড়াতাড়ি নেড়েচেড়ে দেখার পর পিঁপড়ে যতদূর পারে দ্রুতগতিতে তার বাসার দিকে ছুটল।

শিগগিরই সে ফিরে এলো। এবারে আর একা নয় — বন্ধুবান্ধব সমেত।

অর্থাৎ, পিঁপড়ে যত তাড়াহুড়োই করুক না কেন, বন্ধুবান্ধবদের আনার জন্য যত জোরেই পা চালাক না কেন গন্ধ দিয়ে সে তার পথ চিহ্নিত করতে ভোলে নি। গন্ধ তাকে ঠিকই ফেলে যাওয়া শুঁয়োপোকাটার কাছে নিয়ে এলো।

কিন্তু সে কি শুধু নিজের জন্যই পথ চিহ্নিত করে? নাকি এই গন্ধ অন্য পিঁপড়েদেরও দরকার? এমনও ত হতে পারে যে গুপ্ত-সন্ধানীকে সব সময় সামনে দেখতে পেয়ে তারা নিছকই তার অনুসরণ করে?

আমি ঠিক করলাম যাচাই করে দেখব।

গুপ্ত-সন্ধানী পিঁপড়ে অন্যদের আগে আগে ছুটছিল। তাকে যেতে দিয়ে আমি চটপট মাটির ওপর ছড়ি বুলোলাম। গুপ্ত-সন্ধানী আর বাদবাকি পিঁপড়েদের মধ্যে একটা ছোটখাটো খাত সৃষ্টি হল। পিঁপড়েদের দৃষ্টিতে ওটা সম্ভবত ছোটখাটো খাত ছিল না, ছিল সত্যিকারের খাত, এমনকি একটা পরিখাই বা হবে। পিঁপড়েরা অবশ্য এমন বাধাও অবলীলাক্রমে অতিক্রম করে। কিন্তু এক্ষেত্রে তারা ভেবাচেকা খেয়ে গেল, কী করা যায় বুঝে উঠতে না পেরে খাতের সামনে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। তারা অস্থির হয়ে খাতের কিনারায় শুঁড় বুলিয়ে দেখতে লাগল, একদল খাতের মধ্যে নেমে গেল, বাদবাকিরা সর্বক্ষণ কী যেন খুঁজতে খুঁজতে খাত বরাবর ইতস্তত ঘুরতে থাকল।

গুপ্ত-সন্ধানীটি ইতিমধ্যে ছুটতে ছুটতে শুঁয়োপোকার কাছে এসে উপস্থিত হয়েছে, একমাত্র তখনই সে লক্ষ্য করল যে তার পেছনে কেউ নেই। কিছুক্ষণ ভেবেচিন্তে সে ফিরে উল্টো পথ ধরল, খাতটা পর্যন্ত ছুটে গেল, খাত পেরিয়ে ওপারে গিয়ে নিজের সঙ্গী-সাথীদের দেখা পেল — আবার তারা এক জায়গায় মিলে জোট পাকিয়ে আছে।

আবার গুপ্ত-সন্ধানী পিঁপড়ে ছুটতে শুরু করল, খাত পেরিয়ে ছুটল শুঁয়োপোকার দিকে। তার পেছন পেছন এবার কিন্তু পূর্ণ আস্থা নিয়ে বাকি পিঁপড়েরাও ছুটেছে।

আমি স্পষ্ট বুঝতে পারলাম যে গুপ্ত-সন্ধানী পিঁপড়ে গন্ধের সাহায্যে পথ চিহ্নিত করতে গিয়ে শুধু নিজের জন্যই পথ নির্দেশ করে না, নিজের সঙ্গী-সাথীদের জন্যও করে।

ওদের পথে খাত বানিয়ে আমি এই চিহ্নিত পথ বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছিলাম। পিঁপড়েরা চিহ্ন হারিয়ে ফেলল। অথচ তারা তাদের সঙ্গীটিকে দেখতে পেয়েছিল, অন্তত এটা ত দেখতে পেয়েছিল যে সে কোন দিকে ছুটে চলেছে। তবু কিন্তু তারা ওকে অনুসরণ করল না, কেননা গন্ধের আহ্বান তারা আর পাচ্ছে না। ফের পথ চিহ্নিত করে, কোন দিকে এগোতে হবে চিহ্নের সাহায্যে তা দেখানোর উদ্দেশ্যে গুপ্ত-সন্ধানীকে ফিরে আসতে হল।

শুঁয়োপোকাটার কাছে ছুটে গিয়ে পিঁপড়েরা তাকে ধরে পিঁপড়ের ঢিবির দিকে টেনে নিয়ে চলল। পিঁপড়েদের ভারী লাগছিল, তাহলেও ভারটা তাদের সাধ্যাতীত ছিল না। এখানে হঠাৎ আমার মনে হল: এই শুঁয়োপোকাটাকে টেনে নিয়ে যেতে ঠিক যতগুলি পিঁপড়ের দরকার ততগুলিই এলো কেন? আচ্ছা, শিকার যদি আরও হালকা কিংবা আরও ভারী হত? অতগুলি পিঁপড়েই কি তার জন্য আসত? অবশ্য এটা ত যাচাই করেই দেখা যেতে পারে।

আমি পিঁপড়ের ঢিবির সামান্য দূরে একটা ছোট্ট মাকড়সা রাখলাম — ওটাকে নিয়ে যাওয়ার জন্য দুটি-তিনটি পিঁপড়ে যথেষ্ট — রেখে আমি অপেক্ষা করতে লাগলাম।

আগের বারের মতো এবারেও শিকারের জায়গায় গুপ্ত-সন্ধানী পিঁপড়ে এসে হাজির। মাকড়সাটাকে চটপট দেখেশুনে নিয়ে সে সঙ্গে সঙ্গে সাহায্য আনার জন্য ছুটল। শুঁয়োপোকার ক্ষেত্রে যা যা ঘটেছিল এবারেও হুবহু সেসবেরই পুনরাবৃত্তি ঘটল। কেবল এবারে গুপ্ত-সন্ধানী পেছন পেছন যে পিঁপড়ে নিয়ে এলো তারা সংখ্যায় অনেক কম। তবে এই 'বাহিনীর' সকলে একসঙ্গে মিলে মাকড়সাকে ধরে ঢিবির দিকে টেনে নিয়ে চলল।

কিন্তু এমনও ত হতে পারে যে এবারে সাহায্যকারী পিঁপড়েরা দৈবক্রমে সংখ্যায় কম ছিল? আমি পিঁপড়েদের দিকে একের পর এক ছুঁড়ে দিতে লাগলাম নানা রকমের পোকামাকড় — কখনও বড়, কখনও ছোট। প্রতিবারই পিঁপড়ের ঢিবিতে বোঝা টেনে নিতে হলে যে কয়জন সঙ্গীর দরকার, গুপ্ত-সন্ধানী পিঁপড়ে সেই কয়জনকেই সঙ্গে করে আনে। মনে হয় পিঁপড়ের বাসায় 'শ্রমশক্তির' ব্যাপারটা তেমন সহজ নয় — হালকা বোঝা নিতে আসে অল্পসংখ্যক মুটে, আর ভারী বোঝা নিতে — বহুসংখ্যক।

কিন্তু কী করেই বা তারা জানতে পারল ভক্ষ্যদ্রব্যের আয়তন? সম্ভবত গুপ্ত-সন্ধানীটি শিকার কোথায় আছে সে সংবাদ জানানো ছাড়াও জানিয়েছে সেটা কী ধরনের, তাকে টেনে নিয়ে যেতে হলে কতজন মুটের দরকার। অর্থাৎ গন্ধের ভাষায় পিঁপড়েরা যেমন বলতে পারে: 'আমার পিছু পিছু এসো! পস্তাতে হবে না!' যেমন জানাতে পারে শিকার কোথায় আছে, তেমনি তা যে কী ধরনের সে কথাও জানাতে পারে।

কোন কোন বিজ্ঞানীর মতে শিকারের আয়তন অথবা শিকারলব্ধ ভক্ষ্যদ্রব্যের পরিমাণ সম্পর্কে জানায় গন্ধের তীব্রতা — গন্ধ যত উগ্র হবে শিকারও তত বড় এবং তার বিপরীত। কিন্তু এই প্রশ্নটি এখনও যাচাই করে ও সঠিক বিচার করে দেখা দরকার। আবার গন্ধ যত তীব্রই হোক না কেন তা যে বেশিক্ষণ থাকে না এ বিষয়ে কিন্তু কোন সন্দেহই নেই।

সন্দেহ না থাকার আরও একটি কারণ আছে: গন্ধ যদি বেশিক্ষণ

থাকতই তাহলে পিঁপড়েরা সর্বক্ষণ গুলিয়ে ফেলত — শিকার অনেকক্ষণ হল নিয়ে যাওয়ার পরও যে জায়গায় তা পড়ে ছিল তার আশেপাশে তারা অনবরত ঘুরঘুর করে বেড়াত।

প্রসঙ্গত, পিঁপড়েদের মধ্যে এমন কেউ কেউ আছে যারা গন্ধযুক্ত পথ মাটিতে না বানিয়ে বানায় শূন্যে। এরা হল সেই সব জাতের পিঁপড়ে, যারা মরুভূমিতে ও আধা মরুভূমিতে বাস করে। সেখানে দিনের বেলায় মাটি ভয়ঙ্কর তেতে ওঠে, তলপেট দিয়ে সে মাটি স্পর্শ করা খুব কঠিন (একটা কথা বলে রাখি, এই পিঁপড়েরা তোমাদের পরিচিত পিঁপড়েদের মতো নয় — এদের পা লম্বা লম্বা আর এদের উদর ও বক্ষঃস্থল মাটি স্পর্শ করে না)। কীটেরা যখন তরল পদার্থ ছিটায় তখন তারা তলপেটের অগ্রভাগ মাটিতে না চেপে বাঁকিয়ে ওপরের দিকে তোলে। বাতাস না থাকলে গন্ধ বেশ কিছুক্ষণ এক জায়গায় থেকে যায়, দিক নির্দেশ করে।

'জায়গা খালি নেই! অন্যত্র খুঁজে দেখ!'

ঘটনাটা ঘটেছিল ক্যালিফোর্নিয়ায়।

বিশাল বিশাল কালো কালো ভয়ঙ্কর ধোঁয়ার কুণ্ডলীতে গোটা আকাশ ছেয়ে গেল। তিন দিন ধরে শয় শয় ফায়ারম্যান বৃথাই আগুন নেভানোর চেষ্টা করে। সাহায্যের জন্য অন্যান্য স্টেট থেকে ফায়ারম্যানরা ছুটে আসে, হাজার হাজার স্বেচ্ছাসেবী আগুনের মোকাবিলায় নামে। অথচ জ্বলন্ত তৈলসংরক্ষণস্থলের অদূরেই যে একটি লোক নিশ্চিন্তে ইতস্তত ঘুরে বেড়াচ্ছিল সেদিকে কারও নজর পড়ে নি। সব লোকে যখন ব্যস্ত ছিল একটি মাত্র কাজে — আগুনের মোকাবিলায়, তখন এই মানুষটি কিনা ধরে বেড়াচ্ছিল... পতঙ্গ। শেষ পর্যন্ত পুলিশের লোকজন মানুষটি এবং তার অস্বাভাবিক কাজকর্মের প্রতি কৌতূহলী হয়ে পড়ল। দেখা গেল তিনি হলেন এক বিখ্যাত বিজ্ঞানী।

তা, বিজ্ঞানীদের মধ্যে আজব লোকজনের কি আর কমতি আছে! আর এই আজব লোকটি যদি বেছে বেছে অগ্নিকাণ্ডের এলাকায় কীট-পতঙ্গ সংগ্রহ করতে চান তাহলেই বা তাকে রোখে কে?

হ্যাঁ, ব্যাপারটা সেরকমই। কিন্তু পুলিশের লোকজন জানবেই বা কী করে যে বিজ্ঞানী মোটেই খেয়ালবশে অগ্নিকাণ্ডের এলাকায় কীট-পতঙ্গ ধরে বেড়াচ্ছিলেন না? ঘটনাচক্রে জ্বলন্ত তৈলসংরক্ষণস্থলের অনতিদূরে এসে পড়ায় তিনি লক্ষ্য করলেন যে আকাশে অনেক পতঙ্গ উড়ছে। বিজ্ঞানী একটাকে ধরে ফেললেন, তাঁর সন্দেহ রইল না যে এ হল ধোঁয়া-পোকা। এদের নাম ধোঁয়া-পোকা হওয়ার কারণ এই যে এরা সর্বদা দাবানলের দিকে উড়ে আসে — ধোঁয়ার গন্ধ এদের আকর্ষণ করে। এক্ষেত্রে কিন্তু পতঙ্গরা দাবানলের জায়গায় উড়ে আসে নি, এসেছে তৈল-সংরক্ষণস্থল জ্বলনের জায়গায়। বড় কথা হল কোথা থেকে তারা উড়ে এলো? সবচেয়ে কাছাকাছি যে বন তারও অবস্থান কিন্তু অগ্নিকাণ্ডের জায়গা থেকে আশি কিলোমিটার দূরে! পতঙ্গরা কি তাহলে এতটা পথ ভ্রমণ করল? তা-ই বটে। তবে তারা খামোকাই এ কাজ করল — আগুনটা ত আর দাবানলের নয়!

ধোঁয়া অনেক সময়ই পতঙ্গদের ধোঁকা দেয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিজ্ঞানীরা লক্ষ্য করে দেখেছেন যে মাঝে মাঝে ফুটবল ম্যাচ চলাকালে ক্রীড়ামোদীরা উত্তেজনাবশত ঘন ঘন ধূমপান করার ফলে যখন

ধোঁয়া-পোকা

স্টেডিয়ামের মাথার ওপর সত্যিকারের ধোঁয়ার কুণ্ডলী ওঠে, তখন সেখানেও পতঙ্গের দল হানা দেয়। অদ্ভুত ব্যাপার এই যে বহু কিলোমিটার দূর থেকে ধোঁয়ার গন্ধ টের পাবার মতো বিস্ময়কর ঘ্রাণশক্তি থাকা সত্ত্বেও এই পতঙ্গরা কিন্তু ধোঁয়াটা যে কী জাতের তা উপলব্ধি করতে পারে না। তাদের কাছে যে-কোন ধোঁয়াই — নির্দেশ। পরন্তু নির্দেশ কেবল 'পথে নামার' নয়, 'চটপট পথে নামার'।

ঘটনাটা এই যে দাবানলের সময় বেশ কিছু সংখ্যক পোকামাকড় প্রাণ হারায়। ধোঁয়া-পোকারা ডিম পাড়ার উদ্দেশ্যে আধ পোড়া গাছ আর দৈবক্রমে অক্ষত থেকে-যাওয়া ঝোপঝাড়ের দিকে ছুটে যায়। কিছুকাল বাদে পোড়া জায়গায় আবার কচি কচি গাছপালা দেখা দেবে, ঘাস সবুজ হয়ে উঠবে। ইতিমধ্যে ধোঁয়া-পোকাদের ডিম ফুটে লার্ভা বের হবে। অন্যান্য পোকামাকড় এখানে তখনও কম, তাই ধোঁয়া-পোকার লার্ভারা যত খুশি খাবার পেতে পারবে।

কপি-প্রজাপতি

কেবল ধোঁয়া-পোকারাই নয়, আরও বহু কীট-পতঙ্গ তাদের ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্য খাবার সংস্থান রাখে।

সাধারণ কপি-প্রজাপতি এক সময় লক্ষ্য করে দেখ। এ ধরনের প্রজাপতি বিভিন্ন গাছপালার ওপর উড়ে বেড়ায়, কিন্তু ডিম পাড়ে কেবল কপির ওপর। আর কপি যদি নেহাৎই না থাকে তাহলে পাড়ে ঐ জাতের অন্য কোন উদ্ভিদের ওপর। বোঝা যাচ্ছে, প্রজাপতি জানে যে কেবল এই উদ্ভিদগুলিই ভাবী শুঁয়োপোকাদের খাদ্য হতে পারে? জানে বৈ কি। তাকে একথা জানিয়ে দেয় গন্ধ। চতুর্দল পুষ্পের উদ্ভিদে এমন পদার্থ বহুল পরিমাণে আছে যা না হলে কপি-শুঁয়োপোকারা বাঁচতে পারে না। আর এই পদার্থের গন্ধই প্রজাপতিকে বলে দেয়: এখানে এসো, এখানে তোমার সন্তানদের প্রয়োজনীয় সব কিছুই মিলবে! এই কণ্ঠস্বর যে কতটা শক্তিশালী ও কর্তৃত্বব্যঞ্জক তার প্রমাণ তোমরা নিজেরাই পেতে পার।

কপি-শুঁয়োপোকা

গ্রীষ্মকালে, যখন কপি-প্রজাপতিরা ডিম পাড়ে তখন বাঁধাকপির রসে বেড়ার কাঠ কিংবা কাগজের টুকরো ভিজিয়েই দেখ না। একটা চোখে পড়ার মতো জায়গায় — যেখানে কপি-প্রজাপতি দেখা দেয়, সেখানে কাগজটা রেখে দাও। প্রজাপতিরা কাগজের ওপর উড়ে এসে ত বসবেই, ডিমও পাড়বে। অথচ ওটা ত বাঁধাকপির পাতাই নয়, কাগজের পাতা! কিন্তু কীট-পতঙ্গেরা নিজেদের চোখের চেয়ে গন্ধের ভাষাকে বেশি বিশ্বাস করে।

কপি-প্রজাপতির মতোই বহু কীট-পতঙ্গের কাছেও একমাত্র গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হল ডিম পাড়ার এবং ভবিষ্যৎ বংশধরদের পর্যাপ্ত পরিমাণ আহারের উপযোগী জায়গা খুঁজে বার করা। আবার এমন সব কীট-পতঙ্গও আছে যাদের পক্ষে নিজেদের সন্তানদের ভরণপোষণ করা অনেক কঠিন। মূককীটদের যাতে খাবারের অভাব না হয় সেই উদ্দেশ্যে পতঙ্গকে সময় সময় কঠিন, প্রাণপণ লড়াইয়ে নামতে হয়।

তোমরা হয়ত জান যে কোন কোন কীট-পতঙ্গ উদ্ভিদভোজী — তারা উদ্ভিদে বাসা বাঁধে এবং উদ্ভিদই তাদের খাদ্য (অনেক সময় পূর্ণাঙ্গ কীটেরা এবং তাদের লার্ভারাও উদ্ভিদ খায়, অনেক সময় খায় কেবল লার্ভারা)। আবার এমন কীট-পতঙ্গও আছে যারা হিংস্র — তারা অন্যান্য কীট-পতঙ্গ খেয়ে জীবনধারণ করে।

হিংস্র বলতে সচরাচর আমাদের ধারণায় জাগে বাঘ কিংবা সিংহ, নিদেনপক্ষে নেকড়ে — তার দাঁতাল হাঁ, বিশাল বিশাল শ্ব-দন্ত। মনোলোভা ফড়িং-এর ক্ষেত্রে কিংবা উজ্জ্বল লাল ও হলুদ রঙের,

বহুকাল আগেই মানুষ এক অস্বাভাবিক ব্যাপার লক্ষ্য করেছে: শুঁয়োপোকার ভেতর থেকে হঠাৎই খুদে খুদে মাছির মতো পিলপিল করে বেরিয়ে আসতে লাগল ছোট ছোট পতঙ্গ। আজ থেকে প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে এক বিখ্যাত গ্রীক বিজ্ঞানী শুঁয়োপোকা থেকে পতঙ্গ বেরিয়ে আসতে দেখে সিদ্ধান্ত করলেন যে মাছির জন্ম হয় পোকা থেকে।

ব্যাপারটা মোটেই তা নয়। এক ধরনের মাছি এবং কীটাশয়ী নামে পরিচিত কীট-পতঙ্গরা সত্যি সত্যিই শুঁয়োপোকার ভেতর থেকে বেরিয়ে আসে। কিন্তু তারা মোটেই পোকা থেকে জন্মায় না, শুঁয়োপোকার সাহায্যে বড় হয়ে ওঠে। আরও স্পষ্ট করে বলতে গেলে, তাকে ভাঙিয়ে। কীটাশয়ী জাতের স্ত্রী-পতঙ্গরা শুঁয়োপোকার দেহাভ্যন্তরে তাদের ডিম পাড়ে। ডিম ফুটে বেরিয়ে আসে লার্ভা — তারা শুঁয়োপোকার দেহের ভেতরে বাস করে, তিলে তিলে তাকে খেয়ে ফেলে। আর শুঁয়োপোকা যখন মারা যেতে বসে তত দিনে লার্ভারা পূর্ণাঙ্গ মাছিতে পরিণত হয়ে বাইরে বেরিয়ে আসে।

আচ্ছা, তোমরা যখন কীটাশয়ী মাছি সম্পর্কে একটু-আধটু জানলে, তখন খোদ তাকে দেখতে পেলে বেশ হয়। কাজটা তেমন কঠিন নয়: এখন লোকের জানা আছে যে পৃথিবীতে প্রায় ৫০ হাজার জাতের কীট-পতঙ্গ বাস করে, যারা অন্যান্য কীটের দেহাভ্যন্তরে ডিম পাড়ে।

নিতান্তই নিরীহ চেহারার গয়াল পোকার ক্ষেত্রে এই শব্দটা যেন একেবারে খাটে না। অথচ তারাও হিংস্র এবং বেশ পেটুক।

কীট-পতঙ্গরা হিংস্র প্রাণী সম্পর্কে আমাদের ধারণা পালটে দেয়। কিন্তু তার চেয়েও বেশি তারা পালটে দেয় পরজীবীদের সম্পর্কে আমাদের ধ্যানধারণা।

গয়াল পোকা

আমাদের দেশেও তাদের সংখ্যা কম নয় — কয়েক হাজার ধরনের। তারা বহু বিচিত্র হয়ে থাকে — অনধিক তিন মিলিমিটার আকৃতিবিশিষ্ট খুদে জাতের থেকে শুরু করে দৈর্ঘ্যে চার সেণ্টিমিটার পর্যন্ত বিরাটাকার। রিসা আর এফিয়াল্ট নামে পরিচিত এই বিশালকায় কীটাশয়ীদের বাস পর্ণমোচী বৃক্ষের বনে, তারা কাঠের ভেতরে বসবাসকারী লার্ভার মধ্যে ডিম পাড়ে।

কীটাশয়ী এফিয়াল্ট

কীটাশয়ী মাছির গড়ন ছিমছাম, তার দেহ সরু লম্বাটে, ডানা স্বচ্ছ; তার আছে 'অসিফলক' — ডিম্বনলী, যা প্রায়শই মালিকের চেয়ে অনেক বেশি দীর্ঘ হয়ে থাকে। এই মাছি গাছের গা বয়ে দ্রুত ছুটে চলে, কখন কখন শুঁড়জোড়া দিয়ে আস্তে করে বাকলের ওপর টোকা মারে। হঠাৎ সে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে, তার শুঁড়জোড়া দ্রুত নড়তে থাকে। তারপর কীটাশয়ী মাছি এক সেকেণ্ডের জন্য স্থির হয়ে পড়ে, ধীরে ধীরে 'ভঙ্গি নিয়ে' দাঁড়াতে থাকে। এই মুহূর্তে তাকে দেখে মনে হয় যেন কোন অ্যাক্রোবাট হাতে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কেবল কীটাশয়ী মাছিই শীর্ষাসনে খাড়া হয়। এবারে তলপেট বাঁকিয়ে দিয়ে ডিম্বনলীকে গাছের গায়ে ঠেকিয়ে দিয়ে সেখানে তুরপুন চালাতে শুরু করে। কীটাশয়ী মাছির ডিম্বনলী ঘোড়ার চুলের চেয়ে বেশি মোটা নয়, অথচ লার্ভা থাকে গাছের কাণ্ডের তিন-চার সেণ্টিমিটার গভীরে। কাজটা সহজসাধ্য নয়! কাঠ যদি অ্যাস্পেন বা লিণ্ডেনের মতো নরম হয়, তাহলে পাঁচ থেকে দশ মিনিটের মধ্যে ডিম্বনলী লার্ভার অবস্থানস্থলে পেঁৗছে গিয়ে লার্ভার গায়ে বিঁধবে, আর ডিম্বনলী বয়ে ডিম নামতে থাকবে। কাঠ শক্ত হলে এ কাজ আধঘণ্টা, এমনকি এক ঘণ্টা ধরেও চলে।

ডোলিক্সমর্ফা জাতের মাছি

এই পাতলা ও দুর্বল ডিম্বনলী কী করে শক্ত কাঠ ভেদ করল এটা অবশ্যই আশ্চর্যের কথা। তবে আরও বেশি আশ্চর্যের বিষয় হল কী করে কীটাশয়ী মাছি লার্ভা খুঁজে পেল। লার্ভা ত আছে গাছের দেহকাণ্ডের ভেতরে। পরন্তু কীটাশয়ী মাছি যে কেবল তাকে খুঁজে বার করল তা-ই নয় — লার্ভার একেবারে নির্ভুল অবস্থান নির্ণয় করেছে এবং সম্পূর্ণ নির্ভুলভাবে তার ভেতরে নিজের ডিম্বনলী বিঁধিয়েছে — এক চুলও এদিক ওদিক হয় নি।

কীটাশয়ী মাছি যতবারই একাজ করুক না কেন সব সময় সে পুরোপুরি নিখুঁত।

কী করে তার পক্ষে এটা সম্ভব হয়? — তোমরা নিশ্চয়ই জিজ্ঞেস করবে। এ প্রশ্ন বিজ্ঞানীদেরও মনে জাগে। কীটাশয়ী মাছির শুঁড়জোড়ার

প্রতি নজর না দেওয়া পর্যন্ত এ প্রশ্নের উত্তর তাঁরা দিতে পারেন নি।

বনের ভেতরে কীটাশয়ী মাছিকে দেখতে পেলে লক্ষ্য করে দেখবে ঐ শুঁড়জোড়া কী ভাবে 'কাজ করে', তাহলেই বুঝতে পারবে যে লার্ভা অনুসন্ধানের ব্যাপারে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করছে সেগুলি।

আচ্ছা বেশ, না হয় ধরা গেল, গন্ধ শুঁকে কীটাশয়ী মাছি ধরতে পারল কোথায় কোন পোকার লার্ভা আছে। কিন্তু কে তাকে বলে দিল তার অবস্থান কেমন, ঠিক কোথায় ছেঁদা করতে হবে ডিম্বনলীকে তার ভেতরে বেঁধাতে গেলে? বিজ্ঞানীরা আন্দাজ করেন যে এক্ষেত্রেও চূড়ান্ত ভূমিকা গ্রহণ করছে ঘ্রাণশক্তি। অবশ্য এ হল বিশেষ ঘ্রাণশক্তি, বিজ্ঞানীরা যার নাম দিয়েছেন স্থানরসায়নবোধ। এই স্থানরসায়নবোধের কল্যাণে কীট-পতঙ্গরা কোন বস্তু স্পর্শ না করেও তার উপরিভাগের কাছাকাছিতে কেবল শুঁড়জোড়া বুলিয়েই গন্ধের সাহায্যে ঠিক করতে পারে তার আয়তন ও আকৃতি, এমনকি তা মসৃণ না বন্ধুর তাও নির্ধারণ করতে পারে। গন্ধই কীটাশয়ী শ্রেণীর রিসা, বা এফিয়াল্টকে টেনে আনে প্রয়োজনীয় স্থানে, গন্ধ তাকে বাদবাকি সমস্ত কিছুর বিশদ ও যথাযথ বিবরণ দিয়েছে, তাকে বলে দিয়েছে কী করতে হবে।

এফিয়াল্ট ও রিসাকে দেখতে পাওয়া যায় একমাত্র পাইন বনে, তাও তেমন একটা ঘন ঘন নয়। তুলনায় অনেক বেশি ঘন ঘন দেখতে পাওয়া যায় তাদের স্বজাতীয় আপান্টেলেস্ বা খর্বোদরকে — এর পেটটি খাটো বলে এমন নাম। খর্বোদরের চেহারা ছোটখাটো, তার পাগুলি হলুদ রঙের — এতে তাকে বেশ ফিটফাট দেখায়। সে বাঁধাকপির পাতার ওপর দ্রুত ছোটাছুটি করে। তার শিকার — কপি-প্রজাপতির শুঁয়োপোকা, সে লুকিয়ে থাকে না, তাই তাকে খুঁজে পেতেও অসুবিধা হয় না। তবে খর্বোদরের আছে নিজস্ব অসুবিধা, এমনকি বিপদও, যা রিসা ও এফিয়াল্টের জানা নেই। শুঁয়োপোকার ওপর লাফিয়ে পড়ে ডিম্বনলী বিঁধিয়ে দেওয়া, তাকে বার করে এনে আবার বিঁধিয়ে দেওয়া — দু-এক সেকেন্ডের ব্যাপার। কিন্তু শুঁয়োপোকাও ত ঝিমোয় না। মরণ ঘনিয়ে এসেছে জানতে পেরেই বোধহয় সে পাক খেয়ে সরে যায়, মুখ থেকে সবুজ ফেনা বার করে। কীটাশয়ীকে পাশ কাটাতে হয়, কেননা শুঁয়োপোকা যদি তাকে নিজের ফেনা মাখিয়ে দিতে পারে, তাহলে সে মারা যাবে। তবে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই যুদ্ধের শেষে কীটাশয়ীর জয় হয়।

কীটাশয়ী মাছি শুঁয়োপোকার ভেতরে ডিম পাড়ে। কিছু কাল বাদে শুঁয়োপোকার চলাফেরা কমে যায়, তার রং পাল্টায়। প্রথম প্রথম বাকি শুঁয়োপোকাদের থেকে তার কোন তফাত দেখা যায় না। অন্য কোন কীটাশয়ী মাছি কি তার ভেতরে নিজের ডিম পাড়তে চাইবে না? না। কেন, কে জানে ঐ শুঁয়োপোকার ধারে কাছে পর্যন্ত কেউ আর ঘেঁষতেই চায় না।

আপান্টেলেস্ বা খর্বোদর ও কপি-শুঁয়োপোকা

খর্বোদরেরা পাশ দিয়ে ছুটে চলে যায়, আশে পাশে ফিরেও তাকায় না, যেন বাঁধাকপির পাতার ওপর মোটেই কোন শুঁয়োপোকা নেই।

বিজ্ঞানীরা নেহাৎই হালে জানতে পেয়েছেন যে শুঁয়োপোকার ভেতরে ডিম পেড়ে রাখার সময় আর সব কীটাশয়ী মাছিদের মতো খর্বোদরেরাও সেই শুঁয়োপোকার গায়ে যেন লিখন রেখে যায়। মানুষের ভাষায় অনুবাদ করলে সে লিখনের অর্থ দাঁড়ায়: 'জায়গা খালি নেই! অন্যত্র খুঁজে দেখ!' আর 'লিখনটি' লেখাও হয় বেশ স্থায়ী গন্ধ দিয়ে।

'আপন প্রাণ বাঁচা!'

যে আবিষ্কারের কথা এখানে বলা হবে তা অপেক্ষাকৃত হাল আমলের। কারণ মোটেই এ নয় যে প্রশ্নটা বেশ জটিল। অনেক আগে আরও বড় বড় আবিষ্কার হয়ে গেছে। অথচ এটা দেরিতে হল: মাছের ঘ্রাণশক্তি আছে কিনা এই নিয়ে লোকে আসলে মাথাই ঘামায় নি। আর সত্যি বলতে গেলে কি জলের মধ্যে আবার ঘ্রাণশক্তির কথা ওঠে কেন?

কিন্তু সত্যের শক্তি এখানেই যে আজ হোক কাল হোক তার দিকে নজর পড়বেই, তাকে নিয়ে লোকে ভাববেই।

মাছের ঘ্রাণশক্তি আছে কিনা এ প্রশ্ন নিয়ে কে যে প্রথম অনুসন্ধান শুরু করল বলা কঠিন। হয়ত কোন শ্রদ্ধেয় বিজ্ঞানী, হয়ত বা একেবারেই অল্পবয়স্ক কোন অনুসন্ধিৎসু মানুষ, আবার এমনও হতে পারে যে সব কিছুর সূত্রপাত করে এক বুড়ো জেলে — মাছেরা যে পরস্পরের মধ্যে নানা সংবাদ আদান-প্রদান করতে পারে, সেই হয়ত তার সুনিশ্চিত প্রমাণ দেয়। সে যা-ই হোক না কেন, প্রথম পদক্ষেপ থেকেই গবেষকদের জন্য অপেক্ষা করে ছিল আশ্চর্য আশ্চর্য আবিষ্কার।

যে-নদীতে মাছের জন্ম, জীবনের অধিকাংশ সময় সেখান থেকে দূরে কাটানো সত্ত্বেও ডিম ছাড়ার সময় সে কী করে সেখানকার পথ খুঁজে পায় তা দীর্ঘকাল দুর্বোধ্য বলে গণ্য হত। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তার জবাব পাওয়া গেল!

পুঙ্খানুপুঙ্খ গবেষণায় দেখা গেল প্রতিটি নদীর, এমনকি প্রতিটি উপনদীর জলের আপন আপন বিশেষ ও অনন্য রাসায়নিক গঠন আছে। তাই নিজস্ব গন্ধও আছে। কিন্তু তা বলে এটাও কী সম্ভব যে সেই গন্ধ শত শত কিলোমিটার দূরে অবস্থিত মাছদের তাদের জন্মস্থানে টেনে আনে? তা-ই বটে, দেখা গেছে মাছদের ঘ্রাণশক্তি এমনই যে একটা পয়লা নম্বরের কুকুরও তাদের সামনে দাঁড়াতে পারে না। কোন কোন কীট-পতঙ্গের কথা না হয় বাদই দিলাম।

এটা জানার পর বিজ্ঞানীরা বুঝতে পারলেন কী ভাবে মাছ তার জন্ম-জলাশয়ের পথ খুঁজে পায়। তাঁরা বুঝতে পারলেন যে বহু মাছের কাছে ঘ্রাণশক্তি সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ অনুভূতি বললেও চলে। পরীক্ষায় দেখা গেছে যে ঘ্রাণশক্তি থেকে বঞ্চিত মাছ খাদ্যের কাছাকাছি সাঁতরে বেড়ালেও খুব তাড়াতাড়ি অনাহারে মারা যেতে পারে। মাছকে দৃষ্টিশক্তি থেকে

রুই জাতের মাছ
(ফোক্সিনাস্)

বঞ্চিত করলেও সে ঘ্রাণশক্তির সাহায্যে অনায়াসে নিজের খাদ্য খুঁজে পাবে।

ঘ্রাণশক্তির কল্যাণে মাছেরা একে অন্যকে খুঁজে পায়। আর হয়ত বা গন্ধের ভাষায় তারা কথাবার্তাও বলতে পারে? দেখা গেছে তা-ও পারে। এই আবিষ্কারটি হল অপ্রত্যাশিতভাবে।

বিখ্যাত অস্ট্রীয় বিজ্ঞানী কার্ল ফ্রিশকে মাছ নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালানোর সময় বিশেষ জাতের একটি মাছকে চিহ্নিত করতে হয়। মাছটি ধরার পর বিজ্ঞানী সেটির আঁশ সামান্য ঘষে তুলে তাকে আবার জলে ছেড়ে দিলেন। হঠাৎ ঐ মাছগুলির মধ্যে আতঙ্ক শুরু হয়ে গেল। ভয়ে মাছেরা এদিক-ওদিক ছড়িয়ে পড়ল, বেশ কিছু সময় কেটে যাওয়ার পর ওরা আবার আগের জায়গায় ফিরে এলো। অথচ ঐ মাছগুলিকে ট্রেনিং দেওয়া ছিল — ওদের এখানে খাওয়ানো হত এবং ওরা সানন্দে এখানে আসত।

মাছটা কি তাহলে তার বন্ধুদের কিছু জানিয়েছে? ব্যাপারটা অবিশ্বাস্য, কিন্তু অন্য কোন ব্যাখ্যা তখনও মেলে নি।

সন্দেহভঞ্জনের উদ্দেশ্যে কার্ল ফ্রিশ মাছগুলির প্রত্যাবর্তনের প্রতীক্ষায় থাকলেন, আবার মাছটিকে ধরলেন, তাকে মেরে ফেলে জলের মধ্যে ছুঁড়ে দিলেন — মরা মাছ ত আর কোন বিবরণ দিতে পারে না! কিন্তু এবারেও মাছের ঝাঁকের মধ্যে আতঙ্ক শুরু হয়ে গেল। আর সে কি আতঙ্ক! এমনও হতে পারে যে মৃত বন্ধুর চেহারা তাদের ওপর এমন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে?

সন্দেহজনক, কিন্তু আর কী ভাবেই বা মাছদের আচরণ ব্যাখ্যা করা যায়?

তবে ফ্রিশ ইতিমধ্যে কিছু কিছু ব্যাপার আন্দাজ করতে পারছিলেন। তিনি অপেক্ষা করতে লাগলেন কখন মাছেরা ভয় কাটিয়ে উঠে আবার সাঁতরে আসবে; তারপর মাছের টুকরো ছেঁচে ফিল্‌টারের ভেতর দিয়ে ছাঁকার পর যে তরল পদার্থ থেকে গেল তা জলে ঢেলে দিলেন। এই তরল পদার্থের এখন আর কোন আকার নেই — সে না পারে কিছু বলতে, না পারে মাছদের ভয় দেখাতে। তা সত্ত্বেও মাছদের মধ্যে আবার শুরু হয়ে গেল আতঙ্ক — প্রথম দুটি ঘটনার চেয়ে কোন অংশে কম নয়।

উত্তর পাওয়া গেল: মাছেরা ভয় পেয়ে গিয়েছিল গন্ধে। গন্ধ তাদের বলে দেয়: পালা, আপন প্রাণ বাঁচা!

ফ্রিশ বিশেষ জাতের একটি মাছকে চিহ্নিত করেন তার গায়ের আঁশ সামান্য ঘষে তুলে ফেলে। কোথাও কোন একটা গণ্ডগোল হয়েছে এটা মাছদের অনুভব করার পক্ষে এই ঘটনাই যথেষ্ট ছিল। কিন্তু বিপজ্জনক কিছুই ত ছিল না, ছিল সামান্য আঁচড় মাত্র।

ঠিক কথা। তবে মাছের ত্বকে আঘাত করলে ত্বকের বিশেষ কোষ থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে বিপদ-সঙ্কেতমূলক ঘ্রাণ নিঃসৃত হয়। জলে এসে পড়ে 'উদ্বেগ-ছড়ানো পদার্থ', অথবা 'ভীতি-ছড়ানো পদার্থ' — এই নামে তাকে অভিহিত করেছেন বিজ্ঞানীরা। এখন জানা গেছে, সে-পদার্থ কেবল বিশেষ কোন জাতের মাছেরই যে আছে তা নয়, অন্যান্য মাছেরও আছে।

যেমন ধর, পাইক মাছের মুখে গাজন মাছ এসে পড়ল — মারা গেল। কিন্তু ঐ হিংস্র মাছের দাঁত গাজনকে স্পর্শ করতে না করতে তার চামড়া ছড়ে গেল, সঙ্গে সঙ্গে নিঃসৃত হল 'উদ্বেগ-ছড়ানো পদার্থ', জলে ছড়িয়ে পড়ল বার্তা — পালা, যে যার প্রাণ বাঁচা!

মাছটা যদি দৈবক্রমে পাইক-এর মুখবিবর থেকে বেরিয়ে আসতে পারে, তাহলেও আঁচড় আর আঘাত ত তার লেগেছে বটেই, তাই জলে অবশ্যই ছুটবে সংকেতবার্তা: বিপদ, যে যার প্রাণ বাঁচা!

কেবল মাছেরাই যে গন্ধের সাহায্যে বিপদ-সংকেত পাঠায় তা নয়। সাধারণ টোড বেঙের বেঙাচিরা ডিম ফুটে বেরোতে না বেরোতেই গন্ধের ভাষায় 'কথাবার্তা চালাতে' সক্ষম। প্রথম যে শব্দ তারা উচ্চারণ করতে পারে তা হল 'বাঁচা, আপন প্রাণ বাঁচা!'

একটা বেঙাচি যদি সামান্য আঘাতও পায়, কিংবা নেহাৎই কোন রকম অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে — যেমন তাকে যদি একটু চেপে ধরা হয় — তাহলে সঙ্গে সঙ্গে জলে বেরিয়ে আসবে 'আতঙ্ক-ছড়ানো পদার্থ' আর বাদবাকি বেঙাচিরা তৎক্ষণাৎ সাঁতরে সেখান থেকে দূরে সরে যাবে কিংবা জলের তলে ডুব মেরে লুকিয়ে থাকবে। মিনিট কুড়ি বাদে তারা আবার আগের জায়গায় এসে হাজির হবে। তার মানে, কুড়ি মিনিট বাদে 'আতঙ্ক-ছড়ানো পদার্থের' কার্যকলাপ শেষ হয়ে যাবে। গন্ধ চলে যাবে।

আবার দেখ, ইঁদুরদের সতর্কতামূলক 'আতঙ্ক-ছড়ানো গন্ধ' আরও বেশিক্ষণ থাকে। প্রায়ই দেখা যায় ইঁদুর হয়ত ফাঁদে পড়ল, কিন্তু পরে সেই ফাঁদটা যেন যাদুগ্রস্ত হয়ে পড়েছে — ইঁদুরেরা তাকে স্রেফ এড়িয়ে চলছে! ইঁদুরের কলটাকে যতই ধোও আর সেখানে যত মুখরোচক টোপই লাগাও না কেন — কিছুতেই কিছু হবার নয়। এতক্ষণে জানা

গাজন মাছ

পাইক মাছ

গেল ব্যাপারটা কী: মৃত্যুর আগে, শেষ মুহূর্তে ইঁদুর কয়েক ফোঁটা (কিংবা এক ফোঁটা) তরল পদার্থ নিঃসরণে সমর্থ হয়। ঐ তরল পদার্থের গন্ধই যেন বাকিদের এই বলে সতর্ক করে দেয়: সামনে এসো না — এখানে মরণফাঁদ! এটা নিছক এক ভীতসন্ত্রস্ত ইঁদুরের গন্ধ নয়, মৃত্যুভয়ে ভীত ইঁদুরের গন্ধ। এই গন্ধ দীর্ঘকাল থাকে, আর জন্তুরা যতদূর সম্ভব বিপজ্জনক স্থান পরিহার করে চলে।

হ্যাঁ, ইঁদুরেরা বিপজ্জনক স্থান পরিহার করে চলে। বেঙাচিরা একটু কিছু হলেই পালিয়ে যায় কিংবা জলের তলায় ডুব দেয়। মাছেরা উপযুক্ত সংকেত পেলে স্থির হয়ে থাকে — যদি-তাদের রক্ষাবর্ণ থাকে — নয়ত জলের উপরিভাগে উঠে পড়ে, কিংবা পালিয়ে যায়। কিন্তু কোন কোন জীব-জন্তুর উপর বিপদ-সংকেতের প্রতিক্রিয়া হয় অন্য রকম।

দৃষ্টান্তস্বরূপ, কোন লোক মৌচাকের কাছাকাছি এগিয়ে এলে মৌমাছিরা পরিবারের প্রায় সবাই মিলে তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে কেন? এমন আচরণের কারণ অমনিতেই বোধগম্য — এই ভেবে লোকে তা নিয়ে মাথা ঘামায় নি। কিন্তু মৌমাছিরা ত নানা জায়গায় থাকে, অনেকে আবার কোন লোক যে এগিয়ে আসছে তা-ও দেখতে পায় না। তা সত্ত্বেও

মুহূর্তের মধ্যে যথাস্থানে এসে হাজির হয়। দেখা গেছে মৌমাছি যখন হুল ফোটায় তখন বিষের সঙ্গে সঙ্গে সে এমন পদার্থ নিঃসরণ করে যার গন্ধ সংকেত দেয়: বিপদ দেখা দিয়েছে, শত্রু! গন্ধের ভাষায় এই নির্দেশ পেয়ে বাদবাকি মৌমাছিরা আক্রমণ চালায়।

মৌমাছির হুল শত্রুর চামড়ার ভেতরে থেকে যায়। হুলের সঙ্গে সঙ্গে হুল ফোটানোর গোটা যন্ত্র আর গন্ধযুক্ত পদার্থ নিঃসরণকারী গ্রন্থিও ছিঁড়ে পড়ে। মৌমাছি মারা যায়, কিন্তু শত্রু ততক্ষণে তার গন্ধের সাহায্যে চিহ্নিত হয়ে যায়, শত্রুর আর পালানোর কোন পথ থাকে না। সে যদি ছোটেও মৌমাছিরা তার পেছন পেছন ধাওয়া করে: আক্রমণ করার হুকুম আরও মিনিট দশেক কার্যকরী থাকে।

বেঙাচি

প্রায় একই ব্যাপার ঘটে বোলতাদের ক্ষেত্রে, তবে এখানে তফাত মাত্র একটি: এক্ষেত্রে মৌমাছির মতো গন্ধযুক্ত পদার্থ বিষের সঙ্গে নিঃসৃত হয় না। বোলতা এই পদার্থ শত্রুর গায়ে ছিটিয়ে দেয়। অন্য বোলতারা গন্ধ টের পেয়ে — নির্দেশ পেয়ে — শত্রুর বিরুদ্ধে ক্ষিপ্ত আক্রমণ চালাতে যায়।

'আতঙ্ক-ছড়ানো গন্ধ' পিঁপড়েদেরও আছে। সে গন্ধ টের পেয়ে কোন কোন জাতের পিঁপড়ে তাদের লার্ভা সঙ্গে নিয়ে লুকিয়ে পড়ে কিংবা পালায়, আবার কেউ কেউ বিপদ-সংকেত পেলে আক্রমণ করতে যায়। কৌতূহলের বিষয় এই যে আক্রমণকারী পিঁপড়েদের সংকেত অনেকটা দুটি পর্যায়যুক্ত: প্রথমে সে জ্ঞাতিগোষ্ঠীদের ইশারায় ডাকে, তারপর আক্রমণের নির্দেশ দেয়।

কোন একটি পিঁপড়ের পাঠানো বিপদ-সংকেত তেরো সেকেন্ড পরে ছয় সেণ্টিমিটার দূরত্বে ছড়িয়ে পড়ে, তারপর যেন মৃদু হয়ে আসে। পঁয়ত্রিশ সেকেন্ড বাদে অন্য পিঁপড়েদের উপর তা আর কাজ করে না। এই সংকেতের যদি পুনরাবৃত্তি না হয়, তাহলে ধরে নিতে হবে যে বিপদটা বড় গোছের নয়, কিংবা একেবারেই অমূলক প্রতিপন্ন হয়েছে।

এই সংকেতগুলির স্বল্পমেয়াদ অকারণে নয়, কেননা পিঁপড়ের ঢিবিতে সবসময় কিছু না কিছু ঘটছে — ধরা যাক, উটকো কোন পিঁপড়ে সেখানে এসে হানা দিল। কাছাকাছি — ছয় সেণ্টিমিটার দূরত্বের মধ্যে যে-সমস্ত পিঁপড়ে আছে তারা তার মোকাবিলা করতে পারে। এর জন্য গোটা বাসার সকলকে ব্যতিব্যস্ত করে তোলার কোন মানে হয় না। বিপদ যদি গুরুতর হয় তাহলে অন্য পিঁপড়েরাও সংকেত পাঠাতে থাকে। সেক্ষেত্রে বিপদের গন্ধ দ্রুত সমগ্র ঢিবিতে ছড়িয়ে পড়ে আর তখনই ডাকা হয় **'সাধারণ সমাবেশ'**।

লোকে ইতিমধ্যে গন্ধের ভাষা থেকে অনেক শব্দ জানতে পেরেছে,

ইঁদুর

জানতে পেরেছে যে জীব-জন্তুদের জীবনে এই ভাষা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। তবে এটা ঠিক যে সকলের কাছে সমান গুরুত্বপূর্ণ নয়: কারও কারও কাছে এই ভাষা অন্য সব ভাষার চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ, আবার কারও কারও কাছে তার তাৎপর্য দ্বিতীয় স্তরের।

তা সে যাই হোক না কেন, গন্ধের ভাষা আছে, জীব-জন্তুরা সে ভাষা ব্যবহার করে এবং একে অন্যের কথা বেশ বুঝতে পারে।

কর্নেই চুকোভস্কির 'টেলিফোন' নামে একটা কবিতা আছে। তার আরম্ভটা বোধহয় তোমাদের মনে আছে:

টেলিফোন বাজে ঝনঝন।
— বলছেন কে?
— হাতি হে!

দ্বিতীয় অধ্যায়

ধ্বনি আর গানের ভুবন

তা হাতিদের কথা যদি ধর, সত্যি বলতে কি, তারা কথা বলতে পারে কিনা জানি না। কিন্তু গঙ্গা-ফড়িংয়েরা — ঠিক জানি — টেলিফোনে কথা বলতে পারে। এটা অবশ্য ঠিক যে তারা রিসিভার তোলে না, ডায়ালও করে না। তবে তাদের নিছক কথা বলার সুযোগ দিলে তারা কথা বলতে পারে।

গঙ্গা-ফড়িংয়েরা যে গুনগুন করে তা লোকের চিরকালই জানা ছিল। কিন্তু কেন তারা এমন আওয়াজ করে এ প্রশ্ন নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় নি। গুনগুন করে — এই পর্যন্ত। হয়ত বা কিছু করার নেই বলে।

কিন্তু লোকে যত বেশি প্রকৃতির জীবন সম্পর্কে জানতে পারল ততই তাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠতে লাগল: না, গঙ্গা-ফড়িং কিছুই করার নেই বলে গুনগুন করে, তা নয়। আর আদৌ এমন কারণেও নয় যে পৃথিবীতে বাস করতে তার বেশ লাগছে। সত্যি সত্যিই যদি বেশ লাগত তাহলে হত উলটো — তার উচিত হত চুপ করে থাকা; কেননা গানের খেসারত হিশেবে তার নিজের জীবন যাবার ঝুঁকি আছে। সবুজ জিনিসকে ত আর সবুজ ঘাসের ভেতরে দেখার জো নেই। অথচ শুনতে চাইলে শুনতে পার। তার মানে, এমন কোন ব্যাপার আছে যার জন্য সে গুনগুন না করে পারে না। নিশ্চিতভাবে জানা গেছে যে কেবল পুং ফড়িংয়েরাই আওয়াজ করে। কোন কোন বিজ্ঞানী এও অনুমান করলেন

ঝিঁঝিঁ পোকা

যে গুনগুন শব্দের সাহায্যে তারা তাদের বান্ধবীদের ডাকে। কিন্তু আরেক দল বিজ্ঞানী সেটা বিশ্বাস করলেন না। আর তখনই গঙ্গা-ফড়িংয়েরা টেলিফোনে কথা বলল।

বিজ্ঞানীরা ঠিক করলেন এমন এক পরীক্ষা করে দেখবেন যাতে বোঝা যায় স্ত্রী-ফড়িং গান শুনতে পায় কিনা আর সে গানে তার প্রতিক্রিয়াই বা কী রকম হয়। গানের প্রতি সে যদি উদাসীন থাকে তাহলে বুঝতে হবে যাঁরা বিশ্বাস করেন না যে পুং-ফড়িংয়েরা স্ত্রী-ফড়িংদের জন্য গায় তাঁদের কথাই সত্যি। আর যদি দেখা যায় যে এটা তার পক্ষে তুচ্ছ ব্যাপার নয় তাহলে বুঝতে হবে গঙ্গা-ফড়িংয়েরা বাস্তবিকই 'কথাবার্তা' বলতে পারে।

একটা ঘরে টেবিলের ওপর একটি গঙ্গা-ফড়িংকে বসিয়ে দেওয়া হল, তার সামনে রাখা হল টেলিফোন রিসিভারে লাগানো মাইক্রোফোনের মতো একটি মাইক্রোফোন। আরেক ঘরে শব্দগ্রাহী যন্ত্র রেখে সেখানে ছাড়া হল এক স্ত্রী-ফড়িংকে।

কিছুক্ষণ কেটে যাবার পর গঙ্গা-ফড়িং ধাতস্থ হয়ে গান শুরু করল। সে কিন্তু বুঝতেই পারে নি যে কোন তৃণভূমিতে অবস্থান না করে অবস্থান করছে বীক্ষণাগারে আর ধারেকাছে স্ত্রী-ফড়িং নাও থাকতে পারে। মোটকথা ফড়িং গান ধরতে সে গান বয়ে অন্য ঘরে এসে পৌঁছাল, স্ত্রী-ফড়িং তা শুনতে পেল। গঙ্গা-ফড়িংয়ের গুনগুন আওয়াজ কী ভাবে মানুষের ভাষায় রূপান্তর করা যায় সেটা অবশ্য কারও জানা ছিল না। তাছাড়া তাকে রূপান্তর করাও যায় না। তবে স্ত্রী-ফড়িংয়ের আচরণ থেকে সঙ্গে সঙ্গে এটাই স্পষ্ট হয়ে উঠল যে এ গান তারই জন্য। গানের মোদ্দাকথা হল: 'আমি এখানে, এই যে আমি!'

স্ত্রী-ফড়িং কথা বলতে পারে না — এমনকি ফড়িঙে ভাষায়ও নয়। পারলে হয়ত কিছু না কিছু একটা উত্তরও দিত। কিন্তু শব্দ যেহেতু নেই, সেই হেতু কাজ করা দরকার! আহ্বান লক্ষ্য করে সে তাড়াতাড়ি ছুটল। গানটা এসেছে কালো রিসিভারের ভেতর দিয়ে। রিসিভার অবশ্য দেখতে আদৌ গঙ্গা-ফড়িংয়ের মতো নয়। কিন্তু এমনও ত হতে পারে যে সে ওর ভেতরে আছে? স্ত্রী-ফড়িং তাই যন্ত্রের ভেতরে ঢোকার চেষ্টা করে।

এই ভাবে 'টেলিফোনে কথা বলে' গঙ্গা-ফড়িংয়েরা মানুষের কাছে তাদের গোপন রহস্য উদ্‌ঘাটন করল।

কিন্তু একটা রহস্য জানার পর লোকে নতুন এক প্রহেলিকার সম্মুখীন হল: গঙ্গা-ফড়িংয়েরা যে গান গায় অথবা কথাবার্তা বলে তা সবসময় একই রকমের নয় কেন? মনে হয় এই ধ্বনিগুলির অর্থ বিভিন্ন। বাস্তবিকই তাই: যেমন গঙ্গা-ফড়িং জোরাল সঙ্কেত দিচ্ছে — তার মানে, জানাচ্ছে কোথায় সে আছে, ডাকছে তার সঙ্গিনীকে। আবার সঙ্গিনী যখন পাশে তখন গঙ্গা-ফড়িংয়ের গানের সুর পালটে যায় — উচ্চ গ্রামের প্রুতস্বরের জায়গায় হতে থাকে মৃদু, শান্ত।

কিন্তু হঠাৎ সুর আবার চড়ে গেল। এবারে গান প্লুতস্বরের মতো নয়। তাছাড়া সঙ্গিনী যখন পাশে আছে তখন ডাকবেই বা কাকে? না, এখানে ব্যাপারটা অন্য কিছু। ওহো, বোঝা গেছে! দেখা যাচ্ছে অন্য একটি গঙ্গা-ফড়িং এসে হাজির হয়েছে। ওটা এখানে এলো কী করে? ঠিক এখানেই ওর আসার কী এমন ঠেকা পড়ল? সম্ভবত ওর নিজস্ব কোন জায়গা নেই। কিন্তু এখানে জায়গা খালি নেই, তাই জায়গার মালিক চড়া সুরে এ সম্পর্কে আগন্তুককে সাবধান করে দিল। অবশ্য এক্ষেত্রেও আবার বলতে হয় যে গঙ্গা-ফড়িংদের আওয়াজ মানুষের ভাষায় রূপান্তর করা যায় না। এ জায়গা আমার, ভাগ বলছি, নইলে ঠেলা বুঝবি — এভাবে ভাষান্তর করা যায় না। তবে গঙ্গা-ফড়িং শব্দের কোন তোয়াক্কা করে না — একজন চিৎকার করল, অন্যজন শুনতে পেল। আগন্তুক হয় নিজের জন্য অন্য জায়গা খুঁজতে যাবে, নয়ত আইনসঙ্গত মালিককে তাড়ানোর মতলব করবে। তখন শোনা যাবে যুদ্ধের হুংকার আর গঙ্গা-ফড়িংদুটিও একে অন্যের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। পরাজিত গঙ্গা-ফড়িং — সে আইনসঙ্গত মালিক হোক আর আগন্তুক হোক — যে-ই হোক না কেন — পিঠটান দেবে।

ঝিঁঝিঁ গোত্রীয় পোকা

গঙ্গা-ফড়িংদের শ্রবণশক্তি খুবই ভালো, কিন্তু তাদের কান থাকে পায়ের ওপর। আচ্ছা, মাটি ত চমৎকার ধ্বনি পরিবাহী — তাহলে তাদের গান কি মাটিতে পরিবাহিত হয়ে যায় না? এটা যাচাই করে দেখার উদ্দেশ্যে জনৈক প্রাণিবিজ্ঞানী ঠিক করলেন গঙ্গা-ফড়িংদের মাটি থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখবেন, তিনি তাই দুটি পুং-ফড়িংকে বেলুনের সঙ্গে বাঁধলেন। কিন্তু ক্রুদ্ধ গঙ্গা-ফড়িংদুটি সেদিকে কোন মনোযোগই দিলে না — তারা আকাশেও 'গালিগালাজ' ও 'তর্কবিতর্ক' চালিয়ে যেতে লাগল। সুতরাং দেখা যাচ্ছে তারা একে অন্যকে শুনতে পায়, তার মানে ধ্বনি মাটিতে পরিবাহিত হয়ে যায় না।

ঘুঘুরে পোকা

এই ভাবে গঙ্গা-ফড়িংয়েরা কথাবার্তা বলে। তাছাড়া তাদের নিকট ও দূরসম্পর্কীয় জ্ঞাতি — ফড়িং, ঘুঘুরে পোকা — এরাও। তাদের সকলেরই গানের মধ্যে মিল আছে এবং যে 'যন্ত্র' সহযোগে এই গান গাওয়া হয় সেগুলিও মোটামুটি একই রকমের। তাদের একটি ডানায় থাকে চারধারে মোটা শক্ত শিরা দিয়ে ঢাকের ওপর টানটান করা চামড়ার মতো মসৃণ মজবুত ঝিল্লী ধরনের যন্ত্র। অন্য ডানায় আছে খাঁজ-কাটা শিরা। গঙ্গা-ফড়িং এক ডানা দিয়ে অন্য ডানাটা ঘষে, খাঁজ-কাটা শিরা ঐ ডানার শিরার সঙ্গে ঘষা খায়, আর টান ধরা ঝিল্লী যেন ঐ ধ্বনির প্রতিধ্বনি ঘটায়, তাকে জোরদার করে। বলাই বাহুল্য যে নিছক মৃদু ক্যাঁচক্যাঁচ আওয়াজ না বেরিয়ে যাতে গান বেরিয়ে আসে তার জন্য খুব দ্রুত ডানায় ডানা ঘষতে হয়। আর গান যাতে বিভিন্ন

রকমের হয় তার জন্য বিভিন্ন বেগে ও বিভিন্ন শক্তিতে ডানায় ডানায় ঘষা লাগাতে হয়। তাহলেই ধ্বনি হবে কখনও জোরাল, কখনও অপেক্ষাকৃত মৃদু।

আবহাওয়া যখন শান্ত থাকে তখন বহু মিটার দূর থেকে গঙ্গা-ফড়িংদের গান শোনা যায়। আবার মাটির তলায় চুপচাপ সতেরো বছর কাটায় এবং জীবনের মাত্র শেষ কয়েক সপ্তাহ গান গায় এমন কোন কোন জাতের ঝিঁঝিঁ গোত্রীয় পোকার গান স্টীম ইঞ্জিনের শিসের মতো শোনায় আর তা প্রায় আধ কিলোমিটার দূর পর্যন্ত শোনা যায়।

এক জাতের ঝিঁঝিঁ পোকার গান আবার দেড় কিলোমিটার দূর থেকেও শোনা যায়।

কেবল যে গঙ্গা-ফড়িংয়েরা এবং তাদের জ্ঞাতিরাই কথাবার্তা বলতে পারে তা অবশ্য নয়। বিজ্ঞানীরা বর্তমানে গণনা করে দেখেছেন যে প্রায় দশ হাজার জাতের এমন সব কীট-পতঙ্গ আছে যারা কথাবার্তা বলতে পারে। যে-সমস্ত আওয়াজে অর্থাৎ বিভিন্ন সংকেতে তাদের অধিকার আছে কোন কোন ছয়পেয়ের ক্ষেত্রে সেগুলির সংখ্যা বিশেরও ওপরে! তাদের মধ্যে যেমন আছে আহ্বান, হুমকি, তেমনি আছে উত্তেজনা, আর এই মর্মে বিজ্ঞপ্তি যে জায়গা খালি নেই ইত্যাদি। আবার পঙ্গপালদের, যারা পেছনের পায়ের সাহায্যে কথা বলে পায়ে পা ঘষে ধ্বনি সৃষ্টি করে — এমন সংকেতও আছে যা শুনে গোটা পাল আকাশে ওড়ে। এটা কিন্তু মোটেই পাখার আওয়াজ নয় — এ হল বিশেষ সংকেত। পঙ্গপাল ওড়ার সময় যে ধ্বনি সৃষ্টি করে বিজ্ঞানীরা তার টেপ করেন; পরে কয়েকটি পতঙ্গকে বধির করে দেওয়া হল — প্রসঙ্গত, পঙ্গপালের কান থাকে পেটের ওপর — আর তাদের উপস্থিতিতেই 'ওড়ার' সংকেত পুনরুৎপাদন করা হল। বধির পতঙ্গরা সংকেতের প্রতি মন দিল না। বাকিরা কিন্তু আকাশে উড়ল। দেখা যাচ্ছে পতঙ্গদের ডানার প্রয়োজনীয়তা কেবল ওড়ার জন্য নয়, কথাবার্তা চালানোর জন্যও বটে।
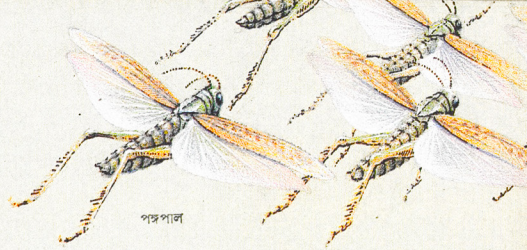
পঙ্গপাল

মৌচাকে গুপ্তচর

প্রযুক্তিবিদরা বহুকাল বুঝতে পারেন নি কেন বৈদ্যুতিক ট্র্যান্সফরমারগুলি প্রায়শই মশায় ঠাসা হয়ে থাকে। কীট-পতঙ্গরা এখানে কিসের আকর্ষণে আসে, কেন বিনাশের মুখোমুখি হওয়ার জন্য তাদের এত প্রয়াস? হতে পারে বিদ্যুতের এমন কোন ধর্ম, যা লোকের কাছে এখনও অজ্ঞাত, অথচ মশাদের পরিচিত?

ইঞ্জিনিয়ার ও প্রযুক্তিবিদরা যখন এই নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন তখন বিজ্ঞানীরা পর্যবেক্ষণ করতে লাগলেন। দেখা যায় বনের ভেতরে ফাঁকা জায়গার মাথার ওপর গোধূলিবেলায় ঘুরে ঘুরে উড়ছে মশার দল। মশাদের পুরো ঝাঁক। ওরা নাচে আর গায়। ওদের কণ্ঠস্বর অবশ্য দুর্বল, কিন্তু তাহলেও... ঘাসের মধ্যে বসে-থাকা গঙ্গা-ফড়িংদের মতো মশারাও নিজেদের জাহির করতে চায়। কিন্তু গঙ্গা-ফড়িংদের অবস্থা ভালো — ওরা জোরে কথাবার্তা বলতে পারে। সে তুলনায় মশাদের অবস্থা খারাপ — তাদের সংকেত দূর থেকে শোনা যায় না। এই কারণে তারা দলবদ্ধ হয়ে সমস্বরে গান গায়। একসঙ্গে মেলার ফলে অবশ্য অনেকটা জোরদার হয়। মশাদের ঐকতান শুনতে পেয়ে তাদের সঙ্গিনীরা উড়ে আসে। দেখতে দেখতে নৃত্যরত মশাদের কাছে উড়ে এলো এক

স্ত্রী-মশক, সঙ্গে সঙ্গে তার দিকে ধেয়ে এলো জনৈক স্তাবক। তারপর উড়ে এলো আরেকটি স্ত্রী-মশক, আরও একটি... এবং চতুর্থ ও পঞ্চম — সবার ক্ষেত্রেই ঘটল সেই একই ব্যাপার। অথচ ষষ্ঠটিকে কেন যেন কেউ আমল দিল না। সপ্তম ও অষ্টমটিকেও নয়... আবার নবমটির এবং দশমটিরও ভাগ্য ভালো দেখা গেল। ব্যাপারটা কী? প্রশ্ন উঠতে পারে ট্র্যান্সফরমারের সঙ্গে এসবের সম্পর্ক কী?

কিন্তু এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার আগে বিজ্ঞানীরা আরও একটি জিনিস আবিষ্কার করলেন। যেমন, সকলেরই জানা আছে যে গীটারের তারে সুর ওঠে একমাত্র তখনই যখন তাকে ছোঁয়া হয়। আর তাতে সুর

মশা
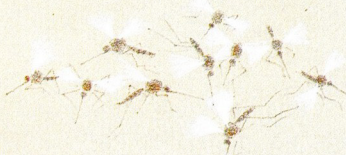
উঠবে কাঁপন লাগার ফলে। তার যত সরু হবে আওয়াজও তত মিহি হবে, কেননা সরু তারে কাঁপন ধরে অনেকটা দ্রুত আর মোটা তারে — অপেক্ষাকৃত ধীরে। তার মানে, কাঁপন যত বেশি, আওয়াজ তত উঁচু পর্দায়, আর কাঁপন যত কম আওয়াজ তত নীচে। এটা কেবল তারের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য নয়। কোন একটা পাতলা ডাল দুলিয়ে দেখ — সাঁই সাঁই আওয়াজ হবে। যত ঘন ঘন দোলাবে সাঁই সাঁই আওয়াজটা তত তীক্ষ্ম হবে। আর কীট-পতঙ্গের পাতলা ফিনফিনে ডানা, যা অতি দ্রুত নড়তে থাকে? হ্যাঁ, তা থেকেও একরকম আওয়াজ বেরোবে বৈকি। কাঁপনের দ্রুততার ওপর নির্ভর ক'রে এই সুর নীচু পর্দার হতে পারে, খাদের হতে পারে আবার পিনপিন আওয়াজের মতো সূক্ষ্ম হতে পারে।

ঘাসফড়িং

কীট-পতঙ্গদের ডানা নানা ধরনের, সেগুলি নানা দ্রুততায় কাঁপতে পারে। যেমন, মাছি সেকেন্ডে ৩৩০-৩৫০ বার পাখা নাড়ে; মৌমাছি — ৩০০ বার, যখন সে মধু নিয়ে ওড়ে আর যখন বোঝা ছাড়া ওড়ে তখন ৪৪০ বার; ভ্রমর — সেকেন্ডে ১৯০-২৪০ বার পাখা নাড়ে, আর মশা নাড়ে — ৫০০-৬০০ বার (কোন কোন জাতের মশা ১০০০ বার পর্যন্ত); বোলতা — ২৫০ বার; গো-মাছি — ১০০ বার; ঘাস-ফড়িং — ৪০-১০০ বার; গয়াল পোকা — ৭৫ বার; মে-পোকা — ৪৫ বার; মথ — ৩৫-৪০ বার; পঙ্গপাল — ২০ বার, ইত্যাদি।

আচ্ছা, পরস্পরের স্পন্দনের মধ্যে যেহেতু এতটা প্রভেদ, সেহেতু ঐ স্পন্দনের ফলে যে ধ্বনি ওঠে তাও সম্ভবত বিভিন্ন রকমের। হ্যাঁ, তা-ই বটে। আর এখানেই বিজ্ঞানীরা ইঞ্জিনিয়ারদের বুঝতে সাহায্য করলেন ট্র্যান্সফরমারের দিকে মশারা যে উড়ে আসে তার কারণ কী। ট্র্যান্সফরমার গুনগুন করে। এই আওয়াজ বহু কীট-পতঙ্গ শুনতে পায়, কিন্তু এতে আকৃষ্ট হয় কেবল মশারাই, কেননা স্ত্রী-মশকরা সেকেন্ডে ৫০০-৫৫০ গতিবেগে ডানা নেড়ে যে আওয়াজ তোলে এটা তার মতো। অতি সূক্ষ্ম পিনপিনে আওয়াজের মতো শুনতে এই আহ্বান-সংকেত অব্যর্থ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে।

কিন্তু আরও অমীমাংসিত প্রশ্ন থেকে গেল: পুং-মশারা কোন কোন স্ত্রী-মশকের প্রতি মনোযোগ দেয়, আবার কারও কারও প্রতি দেয় না — এমন হয় কেন?

বোলতা

মাছি

গো-মাছি

ভ্রমর

এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পেতে সময় লাগল। লোকে বারবার করে মশাদের ওড়া অনুসন্ধান করে দেখল সেকেন্ডে কতবার তাদের ডানা কাঁপে, এসময় যে ধ্বনি ওঠে তা মনোযোগ দিয়ে শুনল। এর ফলেই বোঝা গেল যে মশারা বিভিন্ন ছাঁদে পিনপিন আওয়াজ করে। স্ত্রী-মশকরা পুং-মশাদের তুলনায় সামান্য তীক্ষ্ম। মানুষের কানে অবশ্যই তফাতটা ধরা পড়বে না। কিন্তু মশারা তা চমৎকার ধরতে পারে। আবার স্ত্রী-মশকরাও সকলে যে একই ছাঁদে পিনপিন করে তাও নয়: একেবারে ছোট যারা তারা বড়দের মতো নয়, আবার বুড়িরা — ওদের কারও মতোই নয়। পুং-মশারা তা শুনতে পায়। ছোটদের আর বুড়িদের দিকে তারা মনোযোগ দেয় না: একদলের এখনও সময় হয় নি বনের মাঝখানে ফাঁকা জায়গার মাথার ওপর নাচ-গান করার, অন্যদের সে সময় পেরিয়ে গেছে।

মৌমাছি

কেবল বসন্তকালে ঘুরে ঘুরে নাচ-গান করার সময়ই কিন্তু মশারা কথাবার্তা বলে না।

মশারা সর্বদা একই গতিবেগে ওড়ে না: কখনও দ্রুত, কখনও বা অপেক্ষাকৃত ধীরে। এর অর্থ হল ডানা নাড়ে কখনও ঘন ঘন কখনও বা কম। এরই ফলে ধ্বনি হয় নানা রকমের — উঁচু অথবা নীচু পর্দার, জোরে, আস্তে কিংবা অপেক্ষাকৃত তীক্ষ্ম।

মশারা — জাত হিসাবী, অমনি অমনি তাড়াহুড়ো করে না, অনর্থক শক্তিক্ষয় করে না। কিন্তু সেই মশাও যখন দ্রুত ওড়ে তখন বুঝতে হবে তার বড় দরকার পড়েছে। যেমন, টের পেল কোথায় ফয়দা ওঠানো যায়, অমনি সেখানে ছুটল। জোর ডানা নাড়ায়। কিন্তু অন্যেরাও ঝিমোয় না — নজর রাখে। 'ও এমন ছুটছে কেন? এসো দেখি, শোনা যাক...' ওরা কান পেতে শোনে। এদিকে মশা ব্যস্তসমস্ত হয়ে ছুটছে, জোরে জোরে পাখা ঝাপটে বাতাস কেটে চলেছে আর যেন বলছে: 'খাবার আনতে চলেছি; ঐ ত খাবার, কোথায় খাবার আছে জানি।'

অন্যেরাও তার পিছু পিছু রওনা দেয়।

আবার এমন ঘটনাও ঘটে যখন মশাকে বিপদের হাত থেকে — যেমন ধোঁয়া বা আগুন থেকে — পালাতে হয়। তখন সে তার মশকীয় মনোবল পুরোপুরি প্রয়োগ করে ধেয়ে যায়, চূড়ান্ত গতিতে ডানার সাহায্যে কাজ করে। মশা পালাতে থাকে, তার ওড়ার আওয়াজ হতে থাকে বিশেষ ধরনের। পলায়নরত মশা ডানার সাহায্যে যে আওয়াজ তোলে অন্য মশাদের কাছে তা হল সংকেত-বার্তা: আপন প্রাণ বাঁচা!

কক্-চ্যাফার

মথ

ডানার সাহায্যে মশারা বিপদ সম্পর্কে সতর্ক করে দেয়, নিজেদের অবস্থিতি এবং আরও অনেক কিছু জানায়।

তোমরা ত জানই যে ফুলের মধুর ভার নিয়ে ওড়ার সময় মৌমাছি সেকেণ্ডে প্রায় ৩০০ বার ডানা নাড়ায়, আর ভার ছাড়া যখন ওড়ে তখন ঐ একই সময় ৪৫০ বার ডানা নাড়ায়। তার মানে ভারবাহী মৌমাছির ডানার আওয়াজ হবে মৃদুতর। মৌমাছিরা এই পার্থক্য বহুকাল হল আয়ত্তে এনেছে, এমনকি তারা দূর থেকে জানতে পারে তাদের বান্ধবীটি ভার নিয়ে উড়ছে না ভার ছাড়া উড়ছে। এটা কেবল যে নিছক কৌতূহলের খাতিরে জানা দরকার তা নয়, কেননা তাদের মধ্যে সৎ পরিশ্রমী ছাড়াও এমন কেউ কেউ আছে যারা অন্যের মাথায় কাঁঠাল ভাঙতে ইতস্তত করে না। ফুলে ফুলে উড়ে বেড়াতে, বিন্দু বিন্দু সুধা সংগ্রহের জন্য উদয়াস্ত খাটতে তাদের মন চায় না, তাই অন্য মৌমাছিদের সংগৃহীত মধু চুরি করার উদ্দেশ্যে তারা অপরের মৌচাকে হানা দেওয়ার মতলব করে। বাইরে থেকে এ ধরনের নিষ্কর্মারা দেখতে অনেকটা শ্রমিক মৌমাছিদের মতো, তাই তারা যে-কাউকে ঠকাতে পারে। তবে মৌচাকের প্রবেশপথে যারা থাকে সেই পাহারাদার মৌমাছিদেরই কেবল পারে না। এই মৌমাছিরা দূর থেকে শুনতে পারে কে উড়ে আসছে: ভারবাহী মৌমাছির ডানা তাদের বলে দেয় — আপন জন! পাহারাদাররাও শ্রমিক মৌমাছিকে অবাধে মৌচাকে প্রবেশ করতে দেয়। আর যে চোর সে ধরা পড়ে যায় ডানার আওয়াজে, পাহারাদার মৌমাছিরা তাকে নিজেদের বাড়িতে প্রবেশ করতে দেয় না।

মৌমাছির ডানার আওয়াজ প্রবেশের ছাড়পত্র মাত্র নয়। মৌচাকে উড়ে আসার পর সে ডানার সাহায্যে প্রকাশ করতে পারে কোথায় ছিল, কী

দেখেছে, কী পেয়েছে। এটা অবশ্য ঠিক যে সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্য আর বনের ভেতরকার ফাঁকা জায়গায় সাক্ষাৎকারের বিবরণ সে দিতে অক্ষম। কিন্তু মৌমাছিদের একমাত্র স্বার্থ হল ফুল — কোথায় ফুল আছে, তাতে সুধা আছে কিনা, সে ফুলই বা কেমন। তোমাদের এখন জানা আছে যে কোন কোন তথ্য মৌমাছিরা পেয়ে থাকে গুপ্ত-সন্ধানী মৌমাছির সঙ্গে করে বয়ে আনা গন্ধের কল্যাণে। কিন্তু গন্ধ দিয়ে সব কথা ব্যক্ত করা যায় না। যেমন, মৌমাছিদের প্রয়োজনীয় ফুল কত দূরে আছে তার বিবরণ দেওয়া যায় না। গুপ্ত-সন্ধানী মৌমাছি একথা জানায় পাখার চটচট আওয়াজে। আর জানায় রীতিমতো সঠিকভাবে: সে যদি আধ সেকেণ্ডের সামান্য কম সময় চটচট আওয়াজ করে, তাহলে বুঝতে হবে ফুল আছে শ' দুয়েক মিটার দূরে। বিখ্যাত জার্মান প্রাণিবিজ্ঞানী হ্যারল্ড অ্যাশ মৌমাছিদের পর্যবেক্ষণ করতে গিয়ে লক্ষ্য করেছেন যে পাখার চটচট আওয়াজের স্থিতিকাল (চটচট আওয়াজেরই কথা হচ্ছে, কেননা মৌচাকে মৌমাছি ওড়ে না, সে ডানা ফড়ফড় করে ছুটে বেড়ায়) কেবল দূরত্বের সঙ্গেই যুক্ত নয়, খুঁজে পাওয়া খাবারের উৎকর্ষের সঙ্গেও বটে। গুপ্ত-সন্ধানী মৌমাছি যত মরিয়া হয়ে চটচট আওয়াজ তোলে সন্ধানপ্রাপ্ত খাবারও তত ভালো বুঝতে হবে।

একবার বিজ্ঞানী একটা কৃত্রিম মৌমাছি বানালেন, তাকে মৌমাছিদের ধাঁচে ডানা ফড়ফড় করতে 'শিখিয়ে' মৌচাকে ছেড়ে দিলেন। মৌমাছি নড়েচড়ে চটচট আওয়াজ তোলে আর তার পেছন পেছন ছুটতে থাকে অন্য মৌমাছিরা — নকল মৌমাছি যেদিকে যাওয়ার নির্দেশ দেয় সেখানে রওনা হওয়ার জন্য তারা তৈরি হয় (এই মৌমাছিটার ডানার চটচট

আওয়াজের স্থিতিকাল হয় ০·৪ সেকেন্ড, যার অর্থ: সন্ধানপ্রাপ্ত ফুল আছে ২০০ মিটার দূরে)। কিন্তু অ্যাশ যত দূরদর্শীই হোন না কেন, মনে হল তিনি পুরোপুরি শেখাতে পারেন নি। চাকের মৌমাছিদের কাছে কী একটা ব্যাপার যেন দুর্বোধ্য রয়ে গেল, তাই তারা 'ব্যাখ্যা' কিংবা অতিরিক্ত তথ্য দাবি করল। কিন্তু কৃত্রিম মৌমাছিটা কেবল ডানা ফড়ফড়ই করতে পারে, দিতে পারে কেবল নির্দিষ্ট সংকেত। মনে হল মৌমাছিরা কোন একটা ব্যাপারে তাদের বান্ধবীটির প্রতি সন্দিগ্ধ হয়ে পড়েছে অথবা ধরে নিয়েছে যে তার মাথার গোলমাল হয়েছে, তাই তারা সঙ্গে সঙ্গে ওকে 'মেরে ফেলল'।

বোলতা-জাতের মাছি

অ্যাশ আবার সেই একই পরীক্ষা চালালেন, এবারেও মৌমাছিরা কৃত্রিম গুপ্ত-সন্ধানীটিকে 'মেরে ফেলল'। এরকম অনেকবার চলল। অবশেষে বিজ্ঞানী জানতে পারলেন ব্যাপারটি কী: দেখা যাচ্ছে গুপ্ত-সন্ধানী মৌমাছির বিবরণের পর মৌমাছিদের মধ্যে কেউ একজন ডানার সাহায্যে আওয়াজ তুলে যেন বলে: 'বুঝলাম!' এর পর গুপ্ত-সন্ধানীর কাজ হবে যে-সুধা সে এনেছে তার গন্ধ ঐ মৌমাছিটিকে শুঁকতে দেওয়া। কিন্তু কৃত্রিম মৌমাছি আগের মতোই নড়তে চড়তে থাকে। তখনই তার আচরণে রুষ্ট হয়ে মৌমাছিরা অনাহূত অতিথিকে 'হত্যা করে'।

এটা বোঝার পর অ্যাশ তাঁর কৃত্রিম মৌমাছিকে বিধিমতো আচরণ করতে শেখালেন, এবারে আর ওরা তাকে 'হত্যা করল' না।

তবে কেবল মানুষই যে জাল মৌমাছি তৈরি করতে পারে তা নয়। স্বয়ং প্রকৃতি বেশ কিছু মেকী তৈরি করে রেখেছে — যেমন, নানা রকমের মাছি আছে যারা বোলতা ও মৌমাছির মতো দেখতে। এরা বোলতা-জাতের ও মৌমাছি-জাতের — এই নামেই পরিচিত। বিজ্ঞানীরা অতি সম্প্রতি একটা জিনিস আবিষ্কার করেছেন — দেখা গেছে, প্রতারকদের বাহ্যিক চেহারাই যে কেবল এই মাছিদের শত্রুদের বিভ্রান্ত করে দেয় তা নয়। বোলতা-জাতের ও মৌমাছি-জাতের পতঙ্গরা যাদের অনুকরণ করে তাদেরই মতো একই বেগে তারা পাখাও নাড়ে। বোলতা-জাতের কিংবা মৌমাছি-জাতের এ ধরনের পতঙ্গরা উড়তে উড়তে আশে-পাশের সকলকে জানায়, 'আমি মৌমাছি, আমি মৌমাছি!' কিংবা 'আমি বোলতা, আমি বোলতা!'

ফলে কেউ তাকে স্পর্শ করে না — হুলের খোঁচা খেতে কারই বা সাধ যায়!

চেহারায় এবং 'কণ্ঠস্বরে'ও যদি সে সত্যিকারের মৌমাছি অথবা বোলতার মতো হয়, তাহলে প্রতারণা কী ভাবে ধরা পড়বে?

গ্রীষ্মকালে বনের ভেতরে ফাঁকা জায়গায় ফুল আর উত্তপ্ত মাটির গন্ধ পাওয়া যায়, মধু আর রজনের গন্ধ পাওয়া যায়। বাতাস ভারী ভারী ঠেকে — যেন এগুলির গন্ধে ভরপুর। আর বলাই বাহুল্য, নীরবতা। আশ্চর্য বনের এই বিশেষ নীরবতা — তাতে বিকীর্ণ হয় হাজার হাজার নানাবিধ ধ্বনি, অথচ নীরবতা ভঙ্গ হয় না। সেই সব ধ্বনির মধ্যে আছে মৌমাছির গুনগুন আওয়াজ আর গঙ্গা-ফড়িংয়ের ঝিঁঝিঁ আওয়াজ; ফড়িংয়ের ডানার ফড়ফড়ানি আর মশার পিন পিন ডাক। কীট-পতঙ্গরা কথাবার্তা বলছে। কিসের কথা? কিছু কিছু আমরা ইতিমধ্যেই জানি। কিন্তু আরও অনেক অনেক কথা আমাদের জানতে বাকি রয়ে গেছে।

আর আশ্চর্য হওয়ারও আছে।

নাবিকদের ভুল আর
মৎস্যশিকারীদের গোপন রহস্য

পিতৃভূমির মহাযুদ্ধের সময় উত্তরের নৌবাহিনীতে সম্ভবত এমন কোন লোক ছিল না যে মেট বারাবাসের নাম শোনে নি, ফাশিস্ত জাহাজের অবস্থান সম্পর্কে তাঁর বিস্ময়কর ও দুর্লভ সহজজ্ঞানের কথা, অপূর্ব ক্ষমতার কথা জানত না।

এমন কতকগুলি বিশেষ যন্ত্রপাতি আছে যাদের সাহায্যে ডুবোজাহাজ অনতিদূরে গমনরত জাহাজের সন্ধান পেয়ে থাকে। সে জাহাজ কোন ধরনের, কতটা দূরে তার অবস্থান, কোন পথ ধরে সে চলছে — এই সব প্রশ্ন বিশেষ ব্যাখ্যার দাবি রাখে। কিন্তু যে-ডুবোজাহাজে মেট বারাবাস কাজ করতেন সেখানে বিশেষ ধরনের যন্ত্রপাতির দরকার হত না। জলের তলে ধ্বনি অনুসন্ধানকারী যন্ত্র — হাইড্রোফোন ছাড়া অতিরিক্ত আর কোন যন্ত্রপাতিই মেট-এর লাগত না: একমাত্র ধ্বনির সাহায্যেই তিনি সম্পূর্ণ নির্ভুলভাবে বলে দিতে পারতেন জাহাজের দূরত্ব ও গতিপথ, এমনকি কোন ধরনের জাহাজ তা-ও। বারাবাসের নির্দেশমতো ডুবোজাহাজ আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হত এবং এমন একটি ঘটনাও ঘটত না যেখানে মেট ভুল করেছেন।

সেই দুর্ভাগ্যজনক দিনটিতে বারাবাস প্রপেলারের আওয়াজ শুনতে পেলেন, সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারলেন শত্রুপক্ষের গোটা একটি স্কোয়াড্রন চলেছে। তার গতিপথ এবং প্রতিপক্ষের জাহাজগুলি থেকে দূরত্ব নির্ধারণ করা কঠিন হল না। ক্যাপ্টেন সিদ্ধান্ত নিলেন: শত্রুকে আক্রমণ করতে হবে। এর অর্থ হল ডুবোজাহাজকে দ্রুত উপরিতলে ভেসে উঠতে হবে, আচমকা শত্রুজাহাজের উপর আক্রমণ চালাতে হবে এবং দ্রুত প্রস্থানও করতে হবে। যুদ্ধের সমস্ত রকম প্রস্তুতি নেওয়া হল, কিন্তু... আক্রমণ করা হল না: ডুবোজাহাজ ভেসে উঠে কোন জাহাজই দেখতে পেল না — দেখা গেল, বিপদ-সংকেতের জন্য দায়ী হল কয়েক ঝাঁক মাছ।

মেট বারাবাস নিজের ভুলের জন্য দারুণ মুসড়ে পড়লেন, যদিও পরে জানা গেল যে দোষটা তাঁর নয় — মাছেরা যে আওয়াজ বার করছিল তা সত্যিই সত্যিই অনেকটা জাহাজের প্রপেলারের আওয়াজের মতো।

মেট তখনও মার্কিন নাবিকদের ভুলের কথা জানতেন না। সেকথা জানতে পারলে তিনি হয়ত নিজের ভুলের জন্য অতটা মুসড়ে পড়তেন না।

১৯৪২ সালের বসন্তকালে মার্কিন নৌবাহিনীর মধ্যে ভয়ানক চাঞ্চল্য দেখা দেয়: শত্রুপক্ষের ডুবোজাহাজ এগিয়ে আসছে — এই মর্মে উপকূলবর্তী প্রতিরক্ষা-ঘাঁটিতে সতর্কতাজ্ঞাপনের জন্য আটলাণ্টিক-উপকূলে বিশেষ ধরনের যে-সব যন্ত্রপাতি বসানো ছিল তার সাহায্যে অদ্ভুত আওয়াজ ধরা পড়ে এবং স্থলে পাঠানো হয়। আওয়াজ তীব্র থেকে তীব্রতর হতে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত এত জোরাল হয়ে ওঠে যে
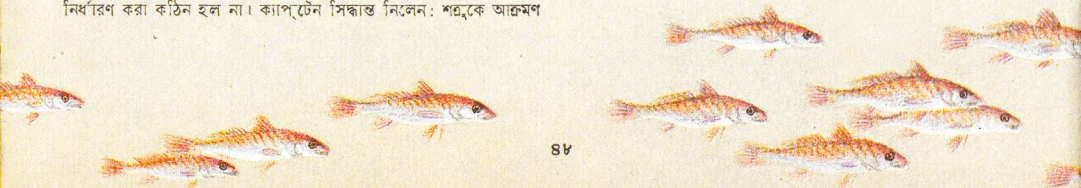
তীরভূমির লোকজন রাতের পর রাত ঘুমোতে পারে না। এ আওয়াজ ডুবোজাহাজের প্রপেলার চলার আওয়াজের মতো ছিল না, বরং ছিল জীবন্ত প্রাণীদের বার করা আওয়াজের মতো। কিন্তু কোন প্রাণীদের? জীববিজ্ঞানীরা এ প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিতে পারলেন না। আশঙ্কা হল যে শত্রু নতুন কোন অস্ত্র পরীক্ষা করছে। তখনই সেনাপতিমণ্ডলী শত্রুর হামলা মোকাবিলা করার উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি অবলম্বন করলেন। প্রতি ঘণ্টায় পরিস্থিতি উত্তরোত্তর উদ্বেগজনক হয়ে দাঁড়াল। অথচ শত্রু কিন্তু হামলা করল না।

কেবল পরে জানা গেল যে এই আতঙ্কসৃষ্টির জন্য দায়ী ছিল ক্রোকার নামে ছোট এক জাতের মাছেরা, যারা উপসাগরে আসত তাদের ডিম ছাড়তে।

বলাই বাহুল্য যে বিজ্ঞানীরা ওদের 'কণ্ঠস্বরে' কৌতূহল বোধ করেন। বহু দেশে বিজ্ঞানীরা 'কান পেতে' মাছদের আওয়াজ শুনতে থাকেন, বিশেষ ধরনের যন্ত্রপাতির ডিজাইন তৈরি করেন, বিশেষ বিশেষ অভিযান সংগঠনে, বিশাল বিশাল অ্যাকোয়ারিয়াম নির্মাণে লেগে যান। তা সত্ত্বেও গোড়ায় কাজ চলল ধীরগতিতে: মাছেরা যে মৌনী, মূক প্রাণী এই বদ্ধমূল ধারণা বর্জন করা ত আর চাট্টিখানি কথা নয়! তায় আবার তাদের বাকশক্তিহীনতার কথা বহু জাতির প্রবাদ-প্রবচনেও ঠাঁই পেয়েছে।

আবার সেই সঙ্গে, যত পরস্পরবিরোধীই হোক না কেন, লোকে বহু কাল থেকেই জানত যে মাছেরা মোটেই তেমন একটা বেসুরো জাতের প্রাণী নয়।

তাই আফ্রিকার উপকূলভাগে বসবাসকারী মৎস্যজীবী কোন কোন জাতির মধ্যে সেই সমস্ত ব্যক্তি পরম শ্রদ্ধার পাত্র রূপে বিবেচিত হন, যাদের 'কান আছে'। শিকারের বড় ভাগটা তারাই পেয়ে থাকে, যদিও তাদের একমাত্র কাজ হল মাছের আওয়াজ 'শুনতে পাওয়া' এবং সেই সম্পর্কে শিকারীদের অবহিত করা।

যাদের 'কান আছে' তারা এই উদ্দেশ্যে সময় সময় জলে ডুব দিয়ে গভীর তলদেশ থেকে ভেসে-আসা আওয়াজ কান পেতে শোনে।

ধারে কাছে মাছ আছে কিনা জানার উদ্দেশ্যে পশ্চিম আফ্রিকার জেলেরা খাড়াভাবে দাঁড় জলে ডুবিয়ে দেয়, দাঁড়ের হাতলে কান ঠেকিয়ে শোনে। কাঠ জলে ভালো ধ্বনি পরিবহণ করে, জেলেরাও তাই জানে ঠিক কোথায় জাল ফেলতে হবে।

ঠিকই, জেলেরা কণ্ঠস্বর শুনে মাছের সন্ধান জানতে পারে, তারা জানে যে মাছ কথা বলতে ওস্তাদ, এমনকি বাচালও। বর্তমানে বুদ্ধিসম্পন্ন ও নিখুঁত যন্ত্রপাতি মানুষের সহায় হওয়ায় জানা গেছে যে জলরাজ্যে কোন নীরবতা নেই, নেই কোন নিস্তব্ধতা। বরং তার উলটো, হাইড্রোফোন সামান্য গভীরে ডুবিয়ে দিলেই হল — বহু বিচিত্র ও বহু চমকপ্রদ ধ্বনির অসাধারাণ ঐকতান শোনা যাবে। এ হল জলরাজ্যের চিৎকার, পিন্‌পিন্‌ আওয়াজ, গর্জন, হোহো হাসি আর গোঙানি।

এই আওয়াজগুলিকে বিজ্ঞানীরা দুটি বিভাগে ভাগ করেছেন।

প্রথম বিভাগে আছে, দৃষ্টান্তস্বরূপ, সেই সব আওয়াজ যেগুলি ওঠে খাদ্য গলাধঃকরণের সময় অথবা সাঁতার কাটার সময়। এর নাম জীবকুলধর্মী রব। আর যদি ধরা যায় চিৎকার, পিন্‌পিন্‌ আওয়াজ, গর্জন, ফোঁসফোঁসানি — সেগুলির নাম হল জীবকুলধর্মী ধ্বনি। এই ধ্বনিই মাছের ভাষা, মাছদের কথাবার্তা। আমরা ও ব্যাপারেই কৌতূহলী।

জলতলের গাইয়ে ও বাচালরা
আর পিলে চম্‌কানো শিসে ডাকাত

আচ্ছা, তাহলে বোবা মাছ নিয়ে যে প্রবাদ-প্রবচন আছে সেটা কী ব্যাপার? এটা অবশ্য ঠিক যে যারা এই সব প্রবাদ ভেবে বার করেছে, মাছদের বোবা মনে করার সঙ্গত কারণ তাদের ছিল। কারণ, মাছেরা কী ভাবে কথাবার্তা বলে তা শুনতে গেলে হয় জলে ডুব দেওয়া দরকার নয়ত কোন উপকরণের সাহায্য নিতে হয় (হাইড্রোফোন না হলেও অন্তত পক্ষে দাঁড় ত বটেই)।

সত্যি কথা বলতে গেলে কি, কোন এক পর্যটক আমাজন নদীর তীরে গোঙানি ও দীর্ঘশ্বাসের মতো অদ্ভুত ও রীতিমতো জোরাল আওয়াজ শুনতে পেয়ে বেশ আশ্চর্য হয়ে যান। আওয়াজ আসছিল জল থেকে, আর ঐ নদীতে যে মাছেরা থাকে তাদেরই 'গান' বলে তা প্রতিপন্ন হয়।

হ্যাঁ, মানুষ সময় সময় বিশেষ ধরনের যন্ত্রপাতি ছাড়াই মাছের কণ্ঠস্বর শুনতে পায়। কিন্তু সে কেবল সময় সময়। কদাচিৎ।

ব্যাপারটা এই যে জলের ভেতরে যে-আওয়াজ ওঠে তা জলের উপরিতলে আসতে আসতে পুরোপুরি মিলিয়ে যায়। জল থেকে হাওয়ায় (ঠিক যেমন হাওয়া থেকে জলে) পৌঁছোয় মাত্র ০·১ শতাংশ ধ্বনি।

বায়ুমণ্ডল যেন জল থেকে আগত ধ্বনি 'গ্রহণ করে না'। এমনকি অক্সিজেন সিলিণ্ডার-বাঁধা ডুব সাঁতারু অথবা ডুবুরিরা অবধি সমুদ্রের আওয়াজ শুনতে পায় না, কেননা তাদের কানের ভেতরে বায়ুস্তর থেকে যায়।

জল বায়ুমণ্ডল থেকে আগত ধ্বনি 'গ্রহণ করে না', বায়ুমণ্ডলের মতোই জল থেকে আগত ধ্বনিকে লোপ করে দেয়।

অথচ জলের একেবারে ভেতরে ধ্বনি চমৎকার পরিব্যাপ্ত হয় — বায়ুমণ্ডলের চেয়ে প্রায় পাঁচগুণ দ্রুতগতিতে। যেখানে বাতাসে ধ্বনি প্রতি সেকেণ্ডে ৩০০ মিটার অতিক্রম করে, সেখানে জলে করে প্রায় ১৫০০ **মিটার!**

সিন্ধুমোরগ

প্লেইস-সিনোগ্লসাস্ (চ্যাপ্টা জাতের মাছ)

রোচ মাছ

এখন আরেকটি জিনিসের ব্যাখ্যা চাই: জলের মধ্যে ধ্বনি বলতে কী বুঝায়? আমরা যে-আওয়াজ শুনি, যাতে আমরা অভ্যস্ত — বায়ুমণ্ডলে পরিব্যাপ্ত ধ্বনি — তা হল বাতাসের কম্পন। যেমন ধর, ঢাকে কাঠির বাড়ি দিলে। ঢাকের টানটান চামড়ায় কম্পন উঠবে, বাতাসে কাঁপন লাগবে। এই কম্পন তোমার কানে পৌঁছুবে, কানের পর্দায় কাঁপন তুলবে আর তাতেই শুনতে পাবে ঢাকের আওয়াজ।

কুঁজোটে মাছ

'জলস্থ ধ্বনি' — এও কম্পন। তবে বাতাসের নয়, জলের। কিন্তু তাহলে তোমরা প্রশ্ন তুলতে পার: মাছেরা কোন কৌশলে এই কম্পন সৃষ্টি করে? — মানুষ আর পশু-পাখির বেলায় না হয় বুঝলাম তারা জিভ, কণ্ঠনালী, নিদেনপক্ষে ফুসফুস কাজে লাগায়। আর মাছের বেলায়? অদ্ভুত শোনালেও, মাছের কথাবার্তা চালানোর, সঙ্কেত প্রেরণের কাজ করে তার পটকা।

পটকাকে ঘিরে থাকে বিশেষ ধরনের পেশী — এই পেশীগুলি পটকার গায়ে আঘাত করে, যেমন আঘাত পড়ে ঢাকের ওপর। তাছাড়া কোন কোন মাছ আছে যারা সত্যিকারের ছর্‌রা পেটানোর কায়দাও জানে। পরন্তু, পটকা এই ধ্বনির শক্তি আরও বৃদ্ধি করে, আর মাছের শরীরে তা বাধাপ্রাপ্ত হয় না — তার শরীর যেন ধ্বনির পক্ষে স্বচ্ছ।

কোন কোন মাছের 'ঢাক' হিশেবে কাজ করে ঝিল্লী দিয়ে কষে বাঁধা বিশেষ রন্ধ্র। মাছ পাখনার দণ্ড দিয়ে এই ঝিল্লীর ওপর ঘা মারে।

কিন্তু মাছ যদি আওয়াজ করতে পারে তাহলে সে আওয়াজ নিশ্চয়ই শুনতেও পারে? তা আর বলতে! বিজ্ঞানীরা বর্তমানে এক হাজারেরও বেশি জাতের এমন এমন মাছের সন্ধান পেয়েছেন যারা কথাবার্তা বলার ক্ষমতা রাখে। সেই সঙ্গে এমন একটি মাছের কথাও জানা যায় নি যে 'কানে কালা'! তার মানে, মাছের কান থাকতেই হবে? অথচ মাছের কান দেখা যায় না, যত খোঁজাখুঁজিই কর না কেন, তার পাত্তা করতে পারবে না।

মাছের কান — তরুণাস্থির সমবায়ে গঠিত বিশেষ ধরনের থলি — অবস্থান করছে মাথার ভেতরে, মগজ থেকে সামান্য দূরে। কর্ণরন্ধ্র নেই। আর তার দরকারও পড়ে না, কেননা আমরা আগেই জানি যে মাছের শরীর আওয়াজ ছাড়ে। আর ধ্বনিতরঙ্গ সহজেই অভ্যন্তরীণ কর্ণে প্রবেশ করে।

মাছের আরও একজোড়া 'কান' আছে। দৈর্ঘ্যে খরগোশ বা গাধা — কারও কানেরই তুলনা তাদের সঙ্গে হতে পারে না। এই কানজোড়া মাছের নিজের দৈর্ঘ্যের সমান দীর্ঘ। এ হল তথাকথিত পার্শ্বরেখা — মাছের গোটা শরীরের আড়াআড়ি টানা বসা জায়গা অথবা খাঁজ। এই দ্বিতীয় কানজোড়া মাছের পক্ষে কোন অংশে কম গুরুত্বপূর্ণ ত নয়ই, হয়ত বা বেশিই। পার্শ্বরেখার কল্যাণে মাছ বেশ দূর থেকে অন্যান্য মাছের এগিয়ে

পার্চ জাতের সবুজে মাছ

আসা টের পায় — যে স্নায়ুগুলি পার্শ্বরেখার কাজ করে তারা খুব বেশি রকমের সংবেদনশীল।

আজভ সাগরের বুলহেড

বাসস্থানের সীমানা নিয়ে সংঘর্ষ চালানোর সময় মাছেরা প্রায়ই একে অন্যের সমান্তরালে আসে এবং লেজের ঝাপটা মেরে প্রতিপক্ষের দিকে জলস্রোত পাঠায়।

পার্শ্বরেখায় জলের আঘাত লাগে, শেষ পর্যন্ত মাছদুটির একটি আর সহ্য করতে না পেরে রণে ভঙ্গ দেয়, মাছেরা 'সংঘর্ষে' লিপ্ত হলেও একে অন্যকে স্পর্শ করল না।

স্টার্জন

এই ভাবে মাছেরা একে অন্যের সঙ্গে কথা বলে। এবারে আমরা মাছের কথা শোনার চেষ্টা করব। এটা অবশ্য ঠিক যে সমুদ্রের গভীর প্রদেশে হাইড্রোফোন নামিয়ে দিয়ে তার সাহায্যে তাদের সত্যিকারের কথাবার্তা শুনতে পেলে আরও আকর্ষণীয় হত। হয়ত বা কোন এক সময় তোমাদের পক্ষেও তা করা সম্ভব হবে। আপাতত এসো, মনে মনে কল্পনা করা যাক যে আমরা সমুদ্রের তলদেশে নেমেছি।

এই ত বেজে উঠল ঘণ্টাধ্বনির মতো আওয়াজ। পরক্ষণেই তার জায়গায় এলো হার্প বাদ্যযন্ত্রের ধ্বনি। এ হল অপূর্ব মাছ প্লেইস-সিনোগ্লসাস্ (চ্যাপ্‌টা জাতের মাছ) 'টুংটাং আওয়াজ করছে', 'খেলছে'। আবার হঠাৎ প্লেইস মাছের আওয়াজকে ছাপিয়ে উঠল শিস, ঘেউঘেউ, গোঁগোঁ আওয়াজ, কোঁকোর-কোঁ ডাক। বাচাল সিন্ধুমোরগরা ঝগড়া বাধিয়ে বসেছে। কিন্তু মোরগদের আওয়াজও আমরা ভালোমতো শুনতে পারলাম না, বেজে উঠল ঢাকের আওয়াজ। এই ভাবে ঢাক পেটায় কুঁজোটে মাছেরা।

সামুদ্রিক বোয়াল মাছ

আবার কে যেন শিস দিল। হয়ত স্টার্জন মাছ, হয়ত বা টোড মাছ। টোড মাছ নাকি? হ্যাঁ, শিসের জায়গায় এলো ঘোঁত-ঘোঁত আওয়াজ। তার মানে টোড মাছই বটে। এখন আবার কে যেন গ্যাঙর-গ্যাঙর করছে, কিচমিচ করছে, গাঁকগাঁক করছে। এ হল আজভ সাগরের গোলগাল বুলহেড মাছ। দেখতে দেখতে চিঁচিঁ আওয়াজ তুলল রোচ মাছ,

কিচিরমিচির করে উঠল হেরিং। এছাড়াও আমাদের কাছে এসে পেঁছোয় আরও অসংখ্য বিচিত্র ধ্বনি — ক্যাঁচক্যাঁচ, গুনগুন, হোহো, হাম্বারব, বকমবকম্ — এমনি কত কি।

বলাই বাহুল্য, এই সব মাছের সবগুলিকে আমরা একত্রে জড় করতে পারি একমাত্র কল্পনায়।

বাস্তবে, একই জায়গায় এদের সকলের দেখা পাওয়া যায় না। কেউ কেউ বাস করে ঈষদুষ্ণ জলে, কেউ — ঠান্ডা জলে, কেউ — নোনা জলে, কেউ বা — মিঠে জলে।

কিন্তু যে-কোন জলেই মাছেরা বাস করুক না কেন, তারা কথাবার্তা

পাইক-পার্চ

বলে, তারা একে অন্যের কথা শুনতে পায়।

আচ্ছা, মাছের কথাবার্তা বলার আর শোনার দরকার কী? সঙ্কেত-জ্ঞাপন থেকে মাছ কী পায়?

আমেরিকার আটলান্টিক সাগরের উপকূল সংলগ্ন জলভাগে সামুদ্রিক

হেরিং

বোয়াল মাছের বাস। এই মাছেরা জোরে ঘোঁত-ঘোঁত আওয়াজ করে। এরা যথারীতি ঘোঁত-ঘোঁত করে রাতে। দিনের বেলায় এরা কম সক্রিয়, অনেকটা যেন ঝিমোয়, ঘোঁতঘোঁতানিও শোনা যায় না। এই ঘোঁতঘোঁতানি কি বনের ভেতরে মানুষের ডাক ছাড়ার মতো নয়? রাতে কি তারা এই সঙ্কেতই দেয় না যে 'আমি এখানে, তুমি কোথায়?' যাতে হারিয়ে না যায়, ঝাঁক যাতে না ভেঙে যায় এই উদ্দেশ্যে কি তারা একে অন্যকে ডাকাডাকি করে না?

আমাদের সকলের পরিচিত হেরিং মাছও বাক্যবিনিময় করে, কিচিরমিচির করে।

সিন্ধুমোরগ — মাছের এই নাম হয়েছে সম্ভবত এই কারণে যে সময় সময় সে কোঁকর-কোঁ ধরনের আওয়াজ বার করে। কোঁকর-কোঁ আওয়াজ সে করে ভয়ে। মাছের ঝাঁক এই আওয়াজ শুনে তৎক্ষণাৎ দৌড়ে পালায় — ধারে কাছে 'আত্মীয়স্বজন' যারা আছে কোঁকর-কোঁ আওয়াজ তাদের এই বলে সতর্ক করে দেয় যে এখানে ভয়ের ব্যাপার দেখা দিয়েছে, বিপদ দেখা দিয়েছে।

সিন্ধুমোরগ ভয়ে কী রকম কোঁকর-কোঁ করে, রোচ মাছের লেজ চেপে ধরলে কী রকম চিঁচিঁ করে, কিংবা স্টার্জন মাছকে ব্যথা দিলে সে কেমন কিঁউকিঁউ করে — হাইড্রোফোনের সাহায্যে তা শোনা যেতে পারে।

আবার দেখ, আরেক জাতের মাছ — পাইক-পার্চ। সে তার বাসা আগলায়। অন্য একটি মাছ তার বাসার দিকে এগিয়ে আসে।

পাইক-পার্চ ফুলকা ছড়িয়ে খুলে দিয়ে নীচু ঠকঠক আওয়াজ ছাড়ল — সঙ্গে সঙ্গে অবাঞ্ছিত আগন্তুক পিঠটান দিল।

কিন্তু কথাবার্তা যে সব সময়ই নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হয় এমন নয়। বিজ্ঞানীরা দুটি খুদে জাতের মাছের ঝগড়া টেপ করেছেন। তাদের কথাবার্তা ছিল কার্তুজ-পোরা টয়-রিভল্‌ভারের গুলির আওয়াজের মতো, মানুষের ভাষায় অনুবাদ করলে তা দাঁড়ায়: 'ভাগ!' — 'যাব না'। — 'শিগগির ভাগ বলছি, নইলে খারাপ হবে!' — 'ওরে, আমার কে রে! তোকে ভয় পাই নাকি?' মোট কথা ব্যাপারটা গড়াল মারপিটে।

পার্চ জাতের রুপোলি মাছ (এঞ্জেল)

বহু মাছ নিজের এলাকা কিংবা নিজের বাসা আগলাতে গিয়ে জোরাল আওয়াজ করে: নট্রোপিস্‌ মাছ ফাঁপা ঢপঢপ বাড়ির মতো আওয়াজ তোলে, আবার পটকা মাছ কর্কশ সুরে গোঁগোঁ করে।

পুরুষ-মাছেরা যখন স্ত্রী-মাছদের সঙ্গে ভাব করে তখন তাদের কণ্ঠস্বর অন্য রকম শোনায়। যে নট্রোপিস মাছ কর্কশ চিৎকার ক'রে প্রতিদ্বন্দ্বীদের ভয় দেখায় সেই আবার এ সময় গায় মৃদু, গুনগুন সুরে গান — প্রণয়-গীতি। আর পটকা মাছ করে তার উল্‌টো — খুব জোরে হাউমাউ করে আর চেঁচিয়ে কাঁদে, প্রতি আধ মিনিট অন্তর অন্তর হাউমাউ করে।

কোন কোন মাছ সারা বছর কথাবার্তা বলে, গান করে, চেঁচায়, কেউ কেউ গায় কেবল প্রেম নিবেদনের সময়, কোন কোন জাতের মাছের পুরুষ

পটকা মাছ

ও স্ত্রী — দুয়েরই 'কথা বলার অধিকার' আছে, আবার কোন কোন জাতের মাছের মধ্যে — কেবল পুরুষেরই আছে।

মাছদের জীবনে ধ্বনির ভূমিকা বিরাট। ওরা আওয়াজকে অনেক সময় দৃষ্টির চেয়েও বেশি বিশ্বাস করে। ঘোলা জলে কণ্ঠস্বর ছাড়া একেবারেই অচল।

বিজ্ঞানীরা বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালান। যেমন সার্ডিনদের ঝাঁকের ভেতরে হাইড্রোফোন নামিয়ে দিয়ে হিংস্র মাছের আওয়াজ বার করা হল। সার্ডিন মাছেরা ছুটে পালাল, যদিও তারা ভালোমতোই দেখতে পেয়েছিল যে আওয়াজ বার করছে হিংস্র মাছ নয়, এমনকি কোন মাছই নয়।

অ্যাকোয়ারিয়ামে ছিল স্ত্রী-বুলহেড মাছ। সেখানে ফ্লাস্কে করে পুরুষ-বুলহেড ছাড়া হল। স্ত্রী-মাছেরা তাকে দেখতে পেয়েও তার দিকে মনোযোগ দিল না, কেননা পুরুষ-মাছটা চুপ করে ছিল। কিন্তু যেই মাত্র পুরুষ-মাছ সমেত ফ্লাস্কের বদলে হাইড্রোফোন নামিয়ে দিয়ে পুরুষ-মাছের প্লুতধ্বনি বার করা হল অমনি মাছেরা ধেয়ে গেল হাইড্রোফোনের দিকে।

জলরাজ্যের নিজস্ব গাইয়ে আছে, বাজিয়ে আছে, বক্তাও আছে। এমনকি নিজস্ব শিসে ডাকাতও আছে।

রুশী রূপকথায় আর বীরগাথায় প্রায়ই উল্লেখ পাওয়া যায় শিসে ডাকাতের — সে গাছে বসে বসে অপেক্ষা করতে থাকে। কেউ গাছের কাছাকাছি এলেই হল — অমনি যা শিস দেবে! তাতে মানুষ আধমরা হয়ে পড়ে যায়। কিংবা অমন শিসে নিদেনপক্ষে জ্ঞান ত হারায়ই। কিন্তু এ হল রূপকথার, বীরগাথার শিসে ডাকাত। সমুদ্রে কিন্তু সত্যিকারের শিসে ডাকাত দেখতে পাওয়া যায়। কেবল সে হল মাছ। এর নাম টোড মাছ। টোড মাছ সচরাচর ঘোঁত-ঘোঁত আওয়াজ করে। কিন্তু ধর জায়গা খালি নেই — এই বলে ঘোঁতঘোঁতানি দিয়ে সতর্ক করে দেওয়া সত্ত্বেও কেউ তার জায়গার ওপর হামলা করে বসল। সেক্ষেত্রে টোড মাছ শিস দেবে — এমন শিস দেবে যে অবাঞ্ছিত আগন্তুকের কানে তালা ধরে যাবে। এ মাছের শিস এতই জোরাল যে মানুষের কানের কাছে যদি সে শিস দেয় তাহলে তার পর্যন্ত অবস্থা কাহিল হয়ে পড়বে: কানের পর্দায় ঐ আওয়াজ সহ্য নাও হতে পারে।

সার্ডিন

টোড মাছ

মাছদের কণ্ঠস্বর বড়ই দরকার। কণ্ঠস্বর তাদের ঝাঁক বেঁধে থাকতে সাহায্য করে, বাসস্থান কিংবা এলাকা আগলাতে এবং বিপদ সম্পর্কে সতর্ক করে দিতে সাহায্য করে। কণ্ঠস্বরের সাহায্যে মাছেরা তাদের অসন্তোষ প্রকাশ করতে পারে, প্রকাশ করতে পারে যুদ্ধংদেহি মনোভাব।

'অকৃত্রিম' কথাবার্তা আদৌ অকৃত্রিম নয়

চারদিন ধরে স্পেনের গ্রানাডা শহরের অধিবাসীরা বুঝে উঠতে পারছিল না কী ঘটছে। থেকে থেকে নানা রাস্তায় নেহাৎই অকারণে বেজে উঠছে পুলিশের তীক্ষ্ন হুইস্‌ল। অথচ না আইন-লঙ্ঘনকারী, না পুলিশ — কাউকেই চোখে পড়ে না।

ড্রাইভারদের অবস্থা হল বড়ই শোচনীয় — তীক্ষ্ন হুইস্‌ল তাদের অনবরত গাড়ি থামাতে বাধ্য করছিল, যদিও তারা নিজেদের কোন অপরাধ উপলব্ধি করতে পারছিল না।

রহস্যময় পুলিশ বাস এবং পদাতিকদেরও চলাচলে বিঘ্ন ঘটাচ্ছিল। পাঁচ দিনের দিন সব স্পষ্ট হল: দেখা গেল অদৃশ্য পুলিশটি হল খাঁচা ছেড়ে উড়ে-আসা এক তোতাপাখি, যে পুলিশের হুইস্‌ল-এর আওয়াজ নকল করতে পারত।

তোতাপাখি

অনেক কাল থেকেই লোকের জানা ছিল যে খাঁচায় বসবাসকারী তোতাপাখিদের শেখালে তারা কথাবার্তা বলতে শুরু করে। কিন্তু দেখা যাচ্ছে তারা পুলিশের হুইস্‌ল নকল করতেও ওস্তাদ।

যাই হোক, কেবল এমনই যে ঘটে তা নয়: তোতাপাখিরা অন্যান্য জীব-জন্তুর — কুকুর-বিড়ালেরও কণ্ঠস্বর অনুকরণ করে; তারা দরজার ক্যাঁচকোঁচ আওয়াজও করতে পারে। তবে সবচেয়ে যা কৌতূহলজনক তা হল 'সত্যিকারের' কথাবার্তা, মানুষের মতো কথাবার্তা বলতে পারা। তোতাপাখিরা ভদ্রভাবে কুশল জিজ্ঞাসা করতে পারে কিংবা বিদায়কালীন নমস্কার জানাতে পারে, কোন কিছুর জন্য অনুরোধ জানাতে পারে, নিজের নাম বলতে পারে, অনুযোগ করতে পারে, এমনকি গালাগালও করতে পারে। প্রাণিবিজ্ঞানীরা, পক্ষিপ্রেমীরা এমন সব তোতাপাখিদের অসংখ্য ইতিবৃত্ত জানেন যারা গোটা একেকটি বাক্য গুছিয়ে বলতে পারে, প্রশ্নের জবাব দেয় এবং নিজেরাও প্রশ্ন করে। প্রায় ক্ষেত্রেই তোতাপাখিদের প্রশ্ন ও মন্তব্য হয় রীতিমতো সঠিক, একেবারে স্থানোপযোগী।

যে-কেউ কথা কইয়ে তোতাপাখিদের দেখেছে এবং তাদের কথা কানে শুনেছে সে-ই হয়ত চিন্তা করেছে: আচ্ছা, এটা কেমন করে হল? পাখি — সে কিনা কথা বলছে! নেহাৎ কতকগুলো অর্থহীন আওয়াজ বার করছে না, অমনি-অমনি কতকগুলো শব্দ উচ্চারণ করছে না — তার ভাষণ পুরোপুরি বুদ্ধিদীপ্ত বলেই মনে হয়। তার মানে কি এই নয় যে তোতাপাখিরা মোটের ওপর মানুষের মতো কথা শেখার ক্ষমতা ধরে?

আচ্ছা, শুরু করা যাক এখান থেকে — সব তোতাপাখি যে কথা বলে এমন নয়, আবার কেবল তোতাপাখিরাই যে কথা বলে তাও নয়।

পাতিকাক, দাঁড়কাক, ম্যাগপাই — এরাও কথা বলতে পারে।
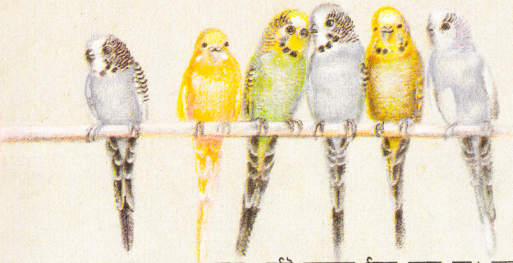
একবার মস্কোর এক থানায় একটি লোককে নিয়ে আসা হয়। তার একটা হাত ভেঙে গেছে। লোকটা ছিল চোর — সে ব্যালকনি দিয়ে একজনের ফ্ল্যাটে চড়াও হওয়ার চেষ্টা করে। ফ্ল্যাটটা ছিল দোতলায়। সে যখন ব্যালকনি পর্যন্ত ওঠে তখন কে যেন জোরে আর কর্কশ স্বরে চেঁচিয়ে ওঠে: 'ওখানে কে? যা-তা কান্ড দেখছি!' হকচকিয়ে গিয়ে চোর ব্যালকনি থেকে ফস্কে পড়ে গেল; বলাই বাহুল্য, সে সন্দেহ করতে পারে নি যে ওটা ছিল এক ম্যাগপাই পাখির কণ্ঠস্বর। পাখিটা গোটা কয়েক বুলি উচ্চারণ করতে পারত।

আমাদের স্টার্লিংয়ের জ্ঞাতি ময়না মানুষের কণ্ঠস্বর বেশ ভালোমতো অনুকরণ করতে পারে। শোনা যায়, জনৈক ইংরেজ ভদ্রলোকের একজোড়া ময়না উড়ে চলে যায়। পক্ষিপ্রেমীটি হতাশ হয়ে পড়েন: তিনি নিশ্চিত যে এত বড় শহরে পাখিদুটোকে খুঁজে বার করা অসম্ভব। কিন্তু শিগ্‌গিরই পাখিদের বাড়িতে পাওয়া গেল। ওদের একটি শহরে ওড়াউড়ির পর পরম নিশ্চিন্তে একজন পথচারীর কাঁধের ওপর উঠে বসে টেলিফোন নম্বর জানায়। সঙ্গে সঙ্গে ঐ টেলিফোন নম্বরে ফোন করে পথচারী পলাতকদের মালিকের ফ্ল্যাটে গিয়ে পড়ে।

অন্য পাখিটিও ঐ একই ভাবে ফেরত পাওয়া যায়।

জে, থ্রাশ, এমনকি ক্যানারিও মানুষের ভাষায় কথা বলতে পারে। এমন ঘটনা অজানা নয় যে একটি ক্যানারি পাখি নিজের নাম উচ্চারণ করতে, সেই সঙ্গে এই বুলিটি আওড়াতে শেখে: 'আহা কী সুন্দর পাখি, ছোট্ট পাখি, চমৎকার পাখি।'

বাকপটু পাখিদের সম্পর্কে মজার মজার, হৃদয়স্পর্শী ও বেশ কৌতূহলজনক অনেক ঘটনার উল্লেখ করা যায়।

কখনও কখনও ঘটনা এতই অসাধারণ যে পাখি যে না-জেনে-শুনে যন্ত্রের মতো কিছু শব্দ আর ছাড়া-ছাড়া বুলি মুখস্থ করে ও আউড়ে কথা বলছে তা বিশ্বাস করা ভার।

আসলে ব্যাপারটা কিন্তু ঠিক তাই।

লক্ষ্য করে দেখ: সব পাখি কিন্তু কথা বলে না। যাদের এই প্রতিভা আছে তাদেরও কথা শিখতে সময় লাগে। আরও সঠিকভাবে বলতে গেলে, তাদের শেখাতে হয়। অবশ্য, তোতাপাখি কখনও কখনও নিজেই কথা বলা শিখতে পারে যদি ঘনঘন, অবশ্যই ঘনঘন — একই শব্দ শোনে। সে সেই শব্দ মনে রাখবে। তার স্বরগ্রন্থি যেহেতু নিজস্ব, পক্ষিসুলভ আওয়াজ ছাড়া অন্যান্য আওয়াজও বার করতে পারে সেই হেতু আজ হোক কাল হোক — একদিন না একদিন তোতাপাখি তা আওড়াবে।

আমার পরিচিত একজনের বাড়িতে এক তোতাপাখি ছিল। প্রতিদিন রেডিওতে প্রাতঃকালীন ব্যায়ামের সম্প্রচার শুনে শুনে কেবল শব্দই নয়, ঘোষকের বাকভঙ্গিও সে চমৎকার আয়ত্তে আনে। একবার পাখিটা মাঝরাতে জেগে উঠে হঠাৎ গোটা ফ্ল্যাট জুড়ে গমগম আওয়াজ তুলল: 'সুপ্রভাত, বন্ধুরা! প্রাতঃকালীন ব্যায়াম শুরু হচ্ছে! পা ফেলার জন্য তৈরি হোন!'

আমার পরিচিত লোকটি ভাবলেন, বোধহয় অতিরিক্ত ঘুম হয়ে গেছে, তাই তিনি তাড়াতাড়ি কাজে যাওয়ার জন্য আয়োজন করতে লাগলেন।

থ্রাশ (দোয়েল-শ্যামা গোত্রীয় পাখি)

তোতাপাখিটা যে কী ভেবে রাতে কথা বলে উঠল — তাও আবার অপ্রাসঙ্গিক — জানি না। তবে তোতাপাখিরা মোটের ওপর প্রায়ই অপ্রাসঙ্গিক কথা বলে — এতে কেউ আশ্চর্য হয় না, কেননা অপ্রাসঙ্গিক কথা লোকে তাড়াতাড়ি ভুলে যায়। অথচ পাখি যদি লাগসই কিছু বলে ফেলে তাহলে সবাই পরম পুলকিত হয়ে ওঠে।

ময়না

ট্রেনিং-পাওয়া কুকুর যখন আমাদের নির্দেশ মানে — বসে, শোয়, পাশে-পাশে চলে, চেঁচানোর নির্দেশ পেলে চেঁচায়, তখন আমরা তেমন আশ্চর্য হই না। সকলেই জানে যে কুকুরকে এটা শেখানো হয়েছে। কুকুরকে শেখানো বড় সহজ ব্যাপার নয় — কুকুর চটপট বুঝে উঠতে পারে না তার কাছ থেকে কী চাওয়া হচ্ছে। কিন্তু অসংখ্য বার নাছোড়বান্দার মতো দাবি করে করে আর মুখে মুখে বলে ধরিয়ে দেওয়ার পর শেষ অবধি সে নির্দেশ পালন করল। এর জন্য সে পায় পারিতোষিক — কোন লোভনীয় খাদ্য। দুবার, তিনবার, পাঁচবার, দশবার — এই করে সে বারবার পারিতোষিক পায়। শেষকালে কুকুর একটা সংযোগ বার করে ফেলে: যেমন, 'বসে পড়!' — একথা শুনে (অর্থ অবশ্যই সে বোঝে না, সে শোনে কেবল নির্দিষ্ট ধ্বনি) যদি সে বসে, তাহলে লোভনীয় খাদ্য মেলে। আর এই কারণে সানন্দে নির্দেশ পালন করে। পরে আর সে লোভনীয় খাদ্য পায় না বটে, কিন্তু আগের মতোই নির্দেশ পালন করে — নির্দিষ্ট শব্দ শুনে নির্দিষ্ট কর্ম পালনে সে অভ্যস্ত হয়ে গেছে।

তোতাপাখিদের ক্ষেত্রেও এই একই কথা বলা যায়। যেমন তোতাপাখিকে তার নাম বলতে শেখানো হয়। নামটা প্রায়ই আওড়ানো হয়। তোতাপাখি শুনে শুনে মুখস্থ করে — তার স্মৃতিশক্তি চমৎকার। তারপর একসময়, হয়ত দৈবাৎ, হয়ত বা নিজের মেজাজ প্রকাশের তাগিদেই সে প্রয়োজনীয় শব্দটি উচ্চারণ করে ফেলে। সঙ্গে সঙ্গে মিলে যায় পারিতোষিক (ধরা যাক, চিনির ডেলা, যদি সে তা ভালোবাসে)। তোতাপাখিও বার করে ফেলে একটা সংযোগ — মুখস্থ শব্দ আওড়ানোর জন্য পাওয়া যায় লোভনীয় খাদ্য। আরও একবার আওড়াল — এবারেও চিনি পেল।

শিগগিরই পাখিকে আর বলতে হবে না, সে নিজেই পারিতোষিক পাওয়ার আশায় নিজেকে 'জাহির করতে থাকবে'। তারপর তা দাঁড়িয়ে যায় অভ্যাসে, তোতাপাখি তখন কোন রকম পারিতোষিক ছাড়াই কথা বলতে থাকে।

জে

টিয়া

অন্য রকম ব্যাপারও ঘটে: যেমন দরজায় ঠকঠক আওয়াজ হতে গৃহস্বামী উত্তরে বললেন, 'আসুন!' তোতাপাখি মনে করে রাখে। অবশেষে ধীরে ধীরে সে বার করে সংযোগ: ঠকঠক আওয়াজ আর সেই আওয়াজের পর 'আসুন' শব্দটি। কিছুকাল বাদে ঠকঠক আওয়াজ শুনলে সে নিজেই বলবে 'আসুন!' এই 'আসুন' কথাটি সর্বদাই লোককে অবাক করে দেয়। অথচ তোতাপাখি কিন্তু এই শব্দটি তখনও বলবে যখন কেউ টেবিলে অথবা দেয়ালে ঠকঠক আওয়াজ করবে। কী ভাবে এবং কেন ঠকঠক করা হচ্ছে তোতাপাখির কাছে সেটা বড় কথা নয়— তার কাছে আওয়াজটাই বড় কথা।

কোন কোন পাখি আছে যারা শব্দ ও আওয়াজ খুব তাড়াতাড়ি মনে রাখতে পারে। এক তোতাপাখির গৃহস্বামিনী প্রায়ই বলতে ভালোবাসতেন, 'কী সাঙ্ঘাতিক!' অথবা নিছকই 'সাঙ্ঘাতিক'। দেখতে দেখতে তোতাপাখিও এই শব্দগুলি উচ্চারণ করতে শিখে ফেলল, সেও সেগুলিকে উচ্চারণ করত বেশ ঘনঘন। একবার গৃহকর্ত্রীর ঘরে অতিথিদের সমাবেশ ঘটল। এক অল্প পরিচিতা মহিলাও এলেন। তিনি ঘরে প্রবেশ করতে না করতে শুনতে পেলেন: 'কী সাঙ্ঘাতিক!' অতিথি ভেবাচেকা খেয়ে থেমে গেলেন, বুঝতে চেষ্টা করলেন এই মন্তব্যের কারণ কী — তাঁর আবির্ভাব, না তাঁর চেহারা। আবার শুনতে পেলেন উঁচু গলায় কে যেন বলছে 'সাঙ্ঘাতিক!' অতিথি রীতিমতো থ বনে গেলেন। গৃহকর্ত্রী যখন তাড়াতাড়ি তাঁর সাহায্যের জন্য এগিয়ে এলেন কেবল তখনই তিনি কিছুটা ধাতস্থ হলেন, কিন্তু সারা সন্ধ্যা তিনি সন্দিগ্ধভাবে আড়চোখে তোতাপাখির খাঁচার দিকে তাকাতে লাগলেন, এদিকে পাখিটা বিন্দুমাত্র বিমূঢ় না হয়ে থেকে থেকে মন্তব্য ছুঁড়ে দিয়ে চলল। তায় আবার তার কণ্ঠস্বর এবং বাচনভঙ্গিও ছিল হুবহু গৃহকর্ত্রীর মতো।

বলাই বাহুল্য, পাখিরা যে বুঝে-শুনে কথা বলে এরকম কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না। যেমন, তোতাপাখিকে শিখিয়েই দেখ না 'আগুন,

কুকুর

আগুন!' সে সারাদিন অগ্নিকাণ্ডের সংবাদ জানিয়ে চেঁচিয়ে যাবে। তাকে পুলিশের অনুকরণে হুইস্‌ল দিতে শিখিয়ে রাস্তায় ছেড়ে দিয়ে দেখ, গ্রানাডায় যা ঘটেছিল তা-ই ঘটবে। তোতাপাখি যদি মাঝে মাঝে সঠিক লক্ষ্যে গিয়ে পৌঁছোয়, তাহলে তা হবে নেহাৎই দৈবাৎ, অথবা তখন, যখন তাকে বিশেষভাবে তালিম দেওয়া হয়েছে নির্দিষ্ট প্রশ্নের উত্তর দিতে।

সত্যি বটে, অন্য রকমও হতে পারে, যেমন হয় সেই ঘটনার ক্ষেত্রে, যখন ঠকঠক আওয়াজের পর তোতাপাখি বলে, 'আসুন!' তোতাপাখিকে কেউ শেখায় নি, এক্ষেত্রে সে যেন নিজেই নিজেকে তালিম দিয়েছে।

যা যা বলা হল সে সবই মানুষের ভাষায় কথা বলতে সক্ষম অন্যান্য পাখির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

কিন্তু তাহলেও এমন কেন ঘটে? কেন কোন কোন পাখি নকল করতে পারে, অথচ অন্যেরা পারে না?

এ প্রশ্নের জবাব দেওয়ার আগে আমি তোমাদের কাছে একটা ঘটনার উল্লেখ করব। এক পক্ষিপ্রেমী অন্য এক পক্ষিপ্রেমীর কাছ থেকে স্টার্লিং

পাখি কেনে। কয়েক দিন কেটে গেল, হঠাৎ একদিন নতুন প্রভুটি অন্য ঘর থেকে শুনতে পান সিস্‌কিন পাখির গান। ব্যাপার কী? সিস্‌কিন কোথা থেকে এলো? আচমকা বন্ধ হয়ে গেল সিস্‌কিনের গান, সঙ্গে সঙ্গে শোনা গেল জোর গলায় কাকের ভাঙা ভাঙা কা-কা ডাক! পক্ষিপ্রেমীটি দৌড়ে ঘরে গেলেন, বলাই বাহুল্য স্টার্লিং পাখি ছাড়া অন্য কাউকে দেখতে পেলেন না। স্টার্লিংটা কিন্তু বিন্দুমাত্র বিভ্রান্ত না হয়ে গলা বাড়িয়ে দিয়ে জোরে জোরে বুলফিঞ্চ পাখির 'পিউ-পিউ' ডাক ছাড়ল।

স্টার্লিং

স্টার্লিং-এর মালিকটি পাখি আর তাদের স্বভাব-চরিত্র ভালোমতোই জানতেন। তিনি বুঝতে পারলেন ব্যাপারটা কী: সম্ভবত স্টার্লিং-এর আগেকার মালিকের সিস্‌কিন, বুলফিঞ্চ ও কাক ছিল। তারা একই ঘরে থাকত। স্টার্লিং বেশ চটপট তাদের ভাষা শিখে ফেলে, ঐ পাখিদের নকল করতে শেখে।

পাখিদের কণ্ঠস্বরের তফাত বোঝার ক্ষমতা যদি তোমাদের থাকে, তাহলে বসন্তকালে পারলে কান পেতে স্টার্লিং-এর গান শুনো। গায় সে খাসা, তবে... যা গায় তা হল 'ধার-করা' গান। হয়ত শুনতে পেলে ভরতপাখির কিংবা হলদে পাখির গান আবার এক মিনিট বাদেই রেডস্টার্ট কিংবা ফিঞ্চ পাখির গান। সময় সময় সুরেলা গান থেমে গিয়ে যা বেরিয়ে আসছে তা তেমন একটা সঙ্গীতধর্মী নয় — কা-কা, প্যাঁক-প্যাঁক কিংবা কোঁকর-কোঁ ডাক। এই সব আওয়াজ এবং আরও বহু আওয়াজ স্টার্লিং শুনে শুনে মুখস্থ করে এবং একান্ত নিজস্ব করে ফেলে।

ব্যাপারটা এই যে স্টার্লিংদের শ্রবণশক্তি প্রখর, তাদের স্মৃতিশক্তিও প্রখর, কিন্তু নিজস্ব গান তাদের নেই। তারা তাই অন্যদের কাছ থেকে গান 'ধার করে'। কেবল গানই বা কেন — স্টার্লিং পাখি কুয়োর কপিকলের ক্যাঁচকোঁচও 'গাইতে' পারে যদি সেই কপিকল থাকে স্টার্লিং-এর বাসা থেকে অনতিদূরে আর স্টার্লিং যদি প্রায়ই সে আওয়াজ শুনতে পায়; সে বেড়ালের মতো মিউ-মিউ করতে পারে কিংবা কোন যন্ত্রের 'গান' গাইতে পারে। তা-ই যদি হয় তাহলে সে মানুষের কণ্ঠস্বর মনে রাখতে পারবে না কেন, অনুকরণ করতে পারবে না কেন? বিশেষ করে তাকে যদি তা শেখানো হয়?

সোনালি ফিঞ্চ

ফিঞ্চ

অন্যের আওয়াজ মনে রাখার এবং তা নকল করার ক্ষমতা বহু পাখির আছে।

এক বিজ্ঞানী একটা ছোট বনে এক ফিঞ্চ পাখির দেখা পান — পাখিটা গাইছিল কেমন যেন বিশেষ ধরনে।

কিছুকাল বাদে, বনের ঐ এলাকায় যে-সব ফিঞ্চ পাখি বাস করত তারা সকলেও ঐ ভাবে — বিশেষ ধরনে গাইতে শিখে গেল।

অন্য এক প্রাণিবিজ্ঞানী সোনালি ফিঞ্চ পাখিদের সঙ্গে একত্রে লালিত-পালিত এক চড়াইপাখিকে পর্যবেক্ষণ করেন: এই চড়াইপাখিটা সোনালি ফিঞ্চের মতো সঙ্কেত দিতে শেখে।

যে-সমস্ত পাখি অন্যদের আওয়াজ রপ্ত করে তাদের বলা হয় অনুকারী পাখি। এমন পাখিও আছে যার সরাসরি নাম দেওয়া হয়েছে হরবোলা। এ পাখি প্রায় তিরিশ রকমের বিভিন্ন আওয়াজ করতে পারে। যাঁরা

হরবোলা

পাখির গানের ভক্ত তাঁরা অনেক সময় একই কামরায় অভিজ্ঞ গায়ক আর ক্যানারির ছানাদের রাখেন। কিছুকাল বাদে ক্যানারির ছানারা সুরের সমস্ত প্রণালী, সমস্ত রকম ওঠা-নামা — এক কথায় তাদের শিক্ষকের গান আয়ত্তে আনে।

উদ্যমী লোকেরা পাখিদের জন্য বিশেষ পাঠশালা পর্যন্ত স্থাপন করে। তারা পাখিদের বিশেষ গান শিখিয়ে পক্ষিপ্রেমীদের কাছে সেসব পাখি বিক্রি করে।

ক্যানারিরা অমনি-অমনিই নামজাদা গাইয়ে হয়ে দাঁড়ায়। তোমরা যদি বনে, ক্যানারির জন্মস্থানে তাকে দেখতে পাও, তাহলে বিশ্বাসই করতে পারবে না যে সামনে আছে এক নামজাদা গাইয়ে।

ঐ ক্যানারির কণ্ঠস্বর আদৌ সে রকম নয়, আর বাইরে থেকে দেখতে গেলে সে অনেকটা সিস্‌কিন পাখির মতো। ঠিক এই চেহারা নিয়েই শ' চারেক বছর আগে ক্যানারি ইউরোপে আসে।

কিন্তু যেহেতু সে ছিল সাগরপারের পাখি এবং যেহেতু সে বিশেষ সম্মানের আসন পায়, হয়ত বা সৈ কারণে, কিংবা হয়ত বা লোকে ক্যানারির প্রতিভা ধরে ফেলে বলে, সে দেখতে দেখতে আদরের গৃহপালিত পাখিতে পরিণত হয়। ক্যানারি পাখি পালন করা হতে থাকে। প্রথমে স্পেনে, পরে ইতালিতে, তারপর জার্মানিতে। জার্মানরা গুরুত্বের সঙ্গে ক্যানারি-চর্চা করে: তারা নতুন নতুন জাতের ক্যানারি লালন-পালন করতে থাকে, তাদের গান শেখায় পরন্তু এই তালিমে রক্ষা করা হত কঠোরতম গোপনীয়তা। জার্মানিতে যে-সমস্ত ক্যানারির উদ্ভব ঘটে তাদের বৈশিষ্ট্য ছিল তথাকথিত বাঁশির সুরের গান, কেননা তাদের 'শিক্ষকরা' বিশেষ ধরনের বাঁশি বাজিয়ে 'ছাত্রদের' গান শেখায়। বুঝতেই পারছ যে তাদের গানের সুর দূর থেকে জার্মান লোকসঙ্গীত বা টিরোলিজ গানের মতো শোনাত।

রাশিয়ায়ও ক্যানারি লালন-পালন করা হতে থাকে। কিন্তু জার্মান শিক্ষকদের সঙ্গে রুশ পক্ষিগীতিভক্তদের তফাত ছিল — তারা ক্যানারিদের বিশেষ ধরনের গান শেখায়। এই ক্যানারিদের গানে শোনা যেত টম্‌টিট, বান্টিং, স্নাইপ আর ভরতপাখিদের কণ্ঠস্বর।

সুতরাং পাখিরা অন্যদের আওয়াজ উচ্চারণ করা শিখতে পারে। কিন্তু সব পাখিই নয়, কেননা সকলের স্বরগ্রন্থির গঠন এক রকম নয়। কোন কোন পাখি নকল করতে পারে কেবল সুললিত গান, কোন কোন পাখি গান এবং কর্কশ আওয়াজ — দুইই তুলতে পারে, আবার কেউ কেউ পারে কেবল কর্কশ আওয়াজ। ঠিক এই কারণেই কাউকে শেখানো যায় শুধু গান গাওয়া, আবার কাউকে তাছাড়াও মানুষের ভাষায় কথা বলা। কিন্তু এসবই অনুকরণমাত্র, যান্ত্রিক মুখস্থবিদ্যা এবং দৈবাৎ উচ্চারণ। তোতাপাখি কিংবা স্টার্লিং, নীলকণ্ঠ কিংবা ময়না শব্দ যত পরিষ্কার ও স্পষ্ট উচ্চারণ করুক না কেন, প্রশ্ন কিংবা কথার তারা যত সঠিক উত্তরই দিক না কেন, তাদের কথাবার্তা যত ভেবেচিন্তে বলার মতোই হোক না কেন — মোটকথা, এই বুলি 'কৃত্রিম'।

'কৃত্রিম' কথাবার্তা আসলে অকৃত্রিম

এক সময় আমার শিকারী হওয়ার বড় সাধ ছিল। আমি থাকতাম সাইবেরিয়ায়, তাইগায় ঘেরা এক ছোট শহরে। বাড়ির পড়শীরা ছিল সত্যিকারের শিকারী — তারা বেশ কিছুকালের জন্য তাইগায় চলে

যেত, দামী দামী শিকার না নিয়ে কখনও ফিরত না। আমিও একটা বন্দুক যোগাড় করলাম, তাইগায় যেতে শুরু করলাম। কিন্তু আমি বড় অমনোযোগী ছিলাম বলে হোক, কিংবা আমার ভাগ্যটা সত্যি সত্যি মন্দ বলেই হোক — এত কালের মধ্যে আমার দ্বারা একটাও গুলি ছোঁড়া হল না। সত্যি কথা বলতে গেলে কি, আমার তাতে কোন আক্ষেপ ছিল না — আমার পিঠে যে বের্দান-রাইফেল ঝুলছে এবং আমি যে যখন-তখন যে-কোন জন্তু বা পাখিকে গুলি করতে পারি — এই চেতনাই আমার পক্ষে যথেষ্ট ছিল। শিকারের পুরস্কারের পুরোপুরি বদলি হত তাইগার কলরব, ঘাসপাতার গন্ধ, সেই সঙ্গে খুদে খুদে কাঠবিড়ালিদের সুরেলা শিস। একদিন তাইগায় ঘুরতে ঘুরতে আমি গুলির আওয়াজ শুনতে পেলাম।

আমি গুলির আওয়াজ অনুসরণ করে চললাম, দেখতে দেখতে উপস্থিত হলাম বনের ধারে। কিছু দূরে অস্পষ্ট ঝলক দিচ্ছে তাইগার গভীর হ্রদ। বলতে গেলে ঠিক পারে দাঁড়িয়ে ছিল আমারই বয়সী একটি ছেলে। মাটিতে ধড়ফড় করছিল সাদাটে ছাইরঙা এক বিরাট পাখি।

বালি হাঁস

ছেলেটা হতবুদ্ধি হয়ে সে দিকে তাকিয়ে ছিল। আমাকে দেখতে পেয়ে সে পাকা শিকারীর ভঙ্গি নিয়ে বলল:

'এই যে হাঁস গুলি করে মেরেছি।'

'হাঁসটা কি... এখনও বেঁচে আছে?' জিজ্ঞেস করার সময় আমি চেষ্টা করছিলাম যাতে পাখিটার দিকে না তাকাতে হয়।

আমি যদিও সারাক্ষণ শিকারের চিন্তা করতাম, তবু সত্যি কথা বলতে গেলে কি কী ভাবে জন্তু কিংবা পাখিকে গুলি করব, কী ভাবে রক্তাক্ত দেহ তুলব তা ধারণায়ই আনতে পারতাম না। আর পাখি কিংবা জন্তু যদি আহত হয়, তাহলে তাদের নিয়ে যে কী করব সেকথা একেবারেই ধারণা করতে পারতাম না।

'ওটা কি এখনও বেঁচে আছে?' আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম।

'হ্যাঁ বেঁচে আছে,' ছেলেটা পাখির দিকে এগিয়ে যেতে যেতে তাচ্ছিল্যভরে বলল। 'সামান্য চোট পেয়েছে।'

পরে অবশ্য আমি বুঝতে পারলাম ছেলেটা একেবারেই আনাড়ী শিকারী। নইলে আহত হাঁসের দিকে ও এগিয়ে যেত না, কেননা এই পাখির ডানার ঝাপ্‌টা কিংবা ঠোঁটের ঠোকর শিয়ালকে মেরে ফেলতে পারে, নেকড়েকে আহত করতে পারে। ছেলেটা কিন্তু আহত হাঁসের দিকে কেবল এগিয়েই গেল না — সে তাকে তুলল। আর পাখিটাও ওর হাতে হঠাৎ নিস্তেজ হয়ে পড়ল। আমরা সঙ্গে সঙ্গে দেখতে পেলাম যে হাঁসটার একটা ডানা ভাঙা।

'এটা আমাকে অন্য পাখি শিকারে সাহায্য করবে। এখানে অনেক হাঁস উড়ে যায়। কেবল অনেক উঁচু দিয়ে। এটা সাহায্য করবে,' শিকারী বলল।

সে হাঁসটা আমার হাতে তুলে দিল, পকেট থেকে সরু দড়ি বার করে একটা প্রান্ত পাখির পায়ে বাঁধল, ছোট একটা ডাল খুঁজে পেতে এনে

হাঁস

অন্য প্রান্ত সেটার সঙ্গে বাঁধল। তারপর ডালটাকে মাটিতে গুঁজে দিল, জুতোর গোড়ালি দিয়ে ঠুকে সেটা আরও ভেতরে পুঁতে দিয়ে আমাকে বলল হাঁসটাকে যেন মাটিতে নামিয়ে দিই।

পাখিটার সম্ভবত ইতিমধ্য সামান্য হুঁশ ফিরে এসেছে, সে মাটিতে নেমে ধীরে ধীরে পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াল। এদিক-ওদিক তাকিয়ে সে প্রথমে ইতস্তত করে, পরে উত্তরোত্তর দ্রুত গতিতে ভাঙা ডানা ছেঁচড়াতে ছেঁচড়াতে বনের ভেতরে ফাঁকা জায়গার ওপর দিয়ে ছুটে চলল। কিন্তু দেখতে দেখতে রসিতে টান পড়ল, পাখি আরও এক পা এগিয়ে গিয়ে পড়ে গেল। তবে পরক্ষণেই উঠে দাঁড়িয়ে দৌড়ানোর চেষ্টা করল, আবার পড়ে গেল। কিছুক্ষণ হাঁসটা ভাঙা ডানা অনেক দূর ছড়িয়ে দিয়ে অনড় হয়ে পড়ে রইল, তারপর উঠে দাঁড়িয়ে অন্য দিকে ছুট দিল। এবারেও রসিতে টান পড়ল, হাঁসটা পড়ি-মরি করে ছুটল, পড়ে গেল, আরও কয়েকবার চেষ্টা করল, শেষকালে হয়ত শক্তি হারিয়ে, হয়ত বা নিজের অবস্থা নৈরাশ্যজনক বিবেচনা করে সে লম্বা ঘাড়টাকে সামনে বাড়িয়ে

দিয়ে চুপচাপ মাটির সঙ্গে লেপটে থাকল।

‘ও কিছু না,’ ছেলেটি আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে বলল, ‘এখন খানিকটা শুয়ে বিশ্রাম করবে, পরে আমাকে সাহায্য করবে। দেখবে ’খন কেমন জমবে আমাদের শিকার। তুমি উড়ন্ত পাখি ভালো শিকার করতে পার ত?’

আমি কোন জবাব দিলাম না, আহত পাখিটাকে কী ভাবে আদায় করা যায় এই ভেবে আমি উৎকণ্ঠা বোধ করছিলাম। আমি এর জন্য সর্বস্ব দিয়ে দিতে প্রস্তুত ছিলাম।

‘লুকিয়ে পড়!’ হঠাৎ আমার সদ্য-পরিচিতটি জোরে ফিসফিস করে বলল। ‘চটপট ঐ ঝোপটার আড়ালে! শুনছ?’

আমি কান খাড়া করতে শুনতে পেলাম এক বিশেষ ধরনের শাঁই-শাঁই আওয়াজ — যেন কেউ জোরে জোরে পাতলা বেতের মতো ডাল হাওয়ায় নাড়ছে। এ হল হাঁসের ঝাঁক — হাঁসেরা তাদের শক্তসমর্থ ডানা ঝাপ্‌টে বাতাস কেটে উড়ে চলেছে।

আহত পাখিটিও সে আওয়াজ শুনতে পেল। তার যা অবস্থা হল তা আমি কখনও ভুলব না। প্রথমে সে খানিকটা মাথা উঁচাল, তারপর লাফ দিয়ে পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে গলা বাড়িয়ে দিল। শাঁ-শাঁ আওয়াজটা

থ্রাশের ছানা

সামনে এগিয়ে এলো, হাঁসটা যেন তার গলা ক্রমাগত বেশি জোর খাটিয়ে ঊর্ধ্বে উঠিয়ে সেদিকে শরীর বাড়িয়ে দিল। অবশেষে গাছপালার মাথার পেছন থেকে এক ঝাঁক হাঁসের আবির্ভাব ঘটল। আমাদের হাঁসটা তৎক্ষণাৎ জোরাল ভেঁপুর আওয়াজ ছাড়ল, ঝাঁকটাও যেন কোন অদৃশ্য প্রাচীরের সঙ্গে হোঁচট খেয়ে পলকের জন্য স্থির হয়ে আকাশে ঝুলে রইল, তারপর দ্রুত নীচে নামতে লাগল। ঝোপের আড়াল থেকে আমি দেখতে পেলাম ছেলেটা উত্তেজিত হয়ে উঠল, সে বন্দুক তুলে ধরল। আমি এক সেকেন্ডের জন্য আহত পাখিটার ওপর চোখ বুলালাম। পাখিটা একটা ঝটকা মারল, ডানা ঝাপ্‌টাল, সত্যি কথা বলতে গেলে কি, একটা ডানায় ঝাপ্‌টা দিল — অন্য ডানাটা — ভাঙা ডানাটা আগের মতোই অসহায়ভাবে ঝুলে রইল; সে খানিকটা লাফ দিল, তারপর হঠাৎ ধপ করে মাটিতে পড়ে গেল। কিন্তু হাঁসের ঝাঁক নীচে নামতেই থাকল। গুলি গুড়ুম করে ছুটল বলে... এমন সময় হাঁসটা যেন কিছু একটা বুঝতে পেরে আবার মাথা ওঠাল, সংক্ষিপ্ত কর্কশ আওয়াজ করল। সে মাত্র একবারই চিৎকার করে উঠে গলা বাড়িয়ে দিয়ে অসহায়ভাবে চোখ বুজে মাটিতে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল। আমি ওপরের দিকে তাকালাম। হাঁসগুলো নীচে নেমে আসতে আসতে যেন আবার অদৃশ্য বাধার গায়ে ধাক্কা খেল — তারা শূন্যে থমকে গিয়ে কয়েক মিনিট বাদেই হ্রদের ওপরে, অনেক দূরে চলে গেল।

আমি ঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়ে এলাম।

'ওটা ওদের সাবধান করে দিয়েছে,' আমার নতুন আলাপীটি কেন যেন ফিসফিস করে বলল। 'সাবধান করে দিয়েছে,' সে আবার বলল। 'অথচ... ডেকেছিল। কিন্তু যখন বুঝতে পারল নিজে উড়ে যেতে পারবে না, তখন সাবধান করে দিল। তোমার কী মনে হয়?'

আমি কোন জবাব না দিয়ে মাটি থেকে গোঁজটা তুলে নিয়ে আহত পাখিটাকে কোলে তুলে নিলাম এবং কোন রকম ইতস্তত না করে শহরের দিকে রওনা দিলাম। কাজটা হয়ত ভালো হয় নি, কেননা হাঁসটাকে গুলি করে নামিয়েছিল ওই ছেলেটা — কিন্তু তখন আমি সেকথা ভেবে দেখি নি: আমার ইচ্ছে ছিল যে করেই হোক পাখিটাকে বাঁচানো।

শহরের একেবারে কাছাকাছি এসে ছেলেটা আমার নাগাল ধরল, আমরা পাশাপাশি চলতে লাগলাম। আমি ভাবলাম ও বুঝি আমার কাছ থেকে হাঁসটা কেড়ে নিতে চাইবে। কিন্তু ও কেবল বলল:

'বেঁচে গেলে... ছেড়ে দিও। বুঝলে?'

আমি সম্মতিসূচক মাথা নাড়লাম।

হাঁসটা বেঁচে গেল, সুস্থ হয়ে উঠতে লাগল আর দিনকে দিন তার মুখে বেশি করে কথা ফুটতে লাগল। সে অসংখ্য রকম আওয়াজ করত: রেগে গেলে এক রকম, আনন্দ হলে অন্য রকম। সে যখন আমাকে দেখতে পেত, যখন খেতে চাইত তখন কি যেন বলত। খাবার যখন পেত তখনও কী যেন বলত — বিড়বিড় করত, যেন কৃতজ্ঞতা জানাত। হাঁসের প্রায় সব কথাই ছিল এক ধারার — 'প্যাঁক-প্যাঁক'। কিন্তু সে যেন একেবারে একেক ধরনে তা আওড়াত — কখনও জোরে, কখনও আস্তে, কখনও দু-তিনবার সে তার 'প্যাঁক-প্যাঁক' আওয়াজ আওড়ায়, কখনও বা অনেক বার।

এই ভাবে আমি প্রথম পাখির ভাষার পরিচয় পেলাম। অবশ্য নিজের পর্যবেক্ষণ সম্পর্কে আমি কাউকে কিছু বললাম না — জানতাম যে আমার কথা কেউ বিশ্বাস ত করবেই না, বরং লোকের হাসি উদ্রেক

করবে। কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস হল যে পাখিরা কথা বলতে পারে। তা সব পাখি যদি না-ও হয় আমার হাঁস যে পারে তাতে কোন সন্দেহই নেই। আমার পুরোপুরি এ বিশ্বাস জন্মাল সেদিন, যেদিন হাঁসটাকে মুক্ত করে দিলাম।

তখন শরৎকাল। পাখিদের ঝাঁক ইতিমধ্যে চলেছে দক্ষিণের দিকে, আমার হাঁস দারুণ অস্থির হয়ে পড়ল। সে তার নিজের ভাষায় আমাকে কী যেন বলত, আমিও বুঝতে পারতাম: তার ভয় হচ্ছে পাছে এখানে শীতকাল কাটাতে হয়, ঠাণ্ডায় জমে যেতে কিংবা অনাহারে মারা যেতে হয়। তখন আমি ওকে ছেড়ে দিলাম। হাঁসটা একেবারে নীচু হয়ে উঠোনের মাথার ওপর এক চক্কর দিল, আরেকটু উঁচুতে উঠে আরও এক চক্কর দিল। তারপর দ্রুত ওপরে উঠতে লাগল। কিন্তু শেষে হঠাৎ খাড়াভাবে নেমে এলো, একেবারে নীচে এসে আরও এক চক্কর দিয়ে জোরে একটা টানা চিৎকার করল। এই চিৎকারের মধ্যে সবই ছিল — ছিল বিদায়বার্তা ও কৃতজ্ঞতা, সুস্থ হয়ে ওঠা আর মুক্তি-পাওয়া পাখির আনন্দ!..

বহু বছর কেটে গেল। একবার আমি বনে একজন লোকের দেখা পেলাম। তার সঙ্গে ছিল একটা ছোট টেপ-রেকর্ডার। আমি অনেকক্ষণ তাকে দূর থেকে লক্ষ্য করলাম — দেখলাম সে সন্তর্পণে কোন একটা

বটেরপাখি

ঝোপের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, অনেকক্ষণ, ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করছে। শেষকালে আমি বুঝতে পারলাম সে পাখিদের কণ্ঠস্বর টেপ করছে! লোকটা যখন শেষ পর্যন্ত বিশ্রাম করতে বসল তখন আমি তার দিকে

বটের-শিকারী বাজ

এগিয়ে গেলাম। বহু বছর কেটে গেলেও আমি কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তাকে চিনতে পারলাম।

'হাঁস। আপনার মনে পড়ে সেই হাঁসটাকে, যে কথা বলতে পারত?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

'হ্যাঁ,' সে আমার দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'সেই যে যেটা বিপদ সম্পর্কে বন্ধুদের হুঁশিয়ার করে দিয়েছিল।'

আমার সেদিনকার দৈবাৎ আলাপীর জীবনে যা ঘটেছিল বলি। যেদিন তাইগায় আমাদের দেখা হয় সেদিন সে প্রথম শিকারে নামে, প্রথম বার গুলি ছোঁড়ে, হাঁস জখম করে, তারপর আর বন্দুক হাতে নেয় নি। কিন্তু ঐ গুলিটিই তার ভাগ্য নির্ধারণ করে দেয়: সে হল জীববিজ্ঞানী, পাখিদের পর্যবেক্ষণ করতে থাকে। এখন তার কৌতূহলের বিষয় — পাখিদের কথাবার্তা।

সে আমাকে লম্বা লম্বা টেপ দেখাল — সেগুলির গায়ে পড়েছে বাঁকা চোরা রেখা। রেখাগুলি কখনও উঠে গেছে ওপরে, কখনও বা হঠাৎ নীচে নেমে আবার উঠেছে — কখনও মন্থর, কখনও তীব্র, কখনও খাড়া। মাঝে রেখা ভেঙে গেছে। এই রেখাগুলি পাখিদের কণ্ঠস্বরের টেপ। এই টেপের নাম সোনোগ্রাম। বিশেষ ধরনের যন্ত্রপাতির সাহায্যে

বিজ্ঞানীরা এতে পাখিদের গান তোলেন। বলাই বাহুল্য, এ চালিয়ে কণ্ঠস্বর শোনা যায় না। কিন্তু তা পড়া যায়, অর্থাৎ বোঝা যায় কোথায় পাখি জোরে গাইছে, কোথায় আস্তে, কোথায় গান থেমে যাচ্ছে। এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

'তাহলে পাখিরা ঠিকই কথা বলে?' আমার আনন্দ হল।

আমার চেনা লোকটি হাসল, কিন্তু কোন জবাব দিল না। পরে আমি বুঝতে পারলাম কেন সে চুপ করে রইল।

মানুষ যতকাল পৃথিবীতে আছে ততকাল ধরে সে শুনে আসছে পাখিদের কণ্ঠস্বর। প্রথম প্রথম শুনতে পেত কেবল বুনো পাখিদের কণ্ঠস্বর, পরে গৃহপালিত পাখিদের আবির্ভাব ঘটতে তাদেরও কণ্ঠস্বর। কিন্তু কেউ কস্মিনকালে এই সব আওয়াজ বোঝার চেষ্টা করে নি, পাখিদের কণ্ঠস্বরের যে কোন অর্থ আছে তা কারও মাথায় পর্যন্ত খেলে নি।

মাত্র কিছু কাল আগে বিজ্ঞানীরা পাখিদের কথাবার্তা নিয়ে কাজ করতে নামেন। সঙ্গে সঙ্গে অত্যন্ত কৌতূহলোদ্দীপক ব্যাপার আবিষ্কার করে ফেলেন। কিন্তু বড় কথা হল — হাজার হাজার হেঁয়ালি আর প্রশ্ন সেখানে রয়ে গেল। বাস্তব বাধাবিপত্তিও বিজ্ঞানীদের অন্তরায় হয়ে দাঁড়াল। দেখা যাচ্ছে যে কেবল গবেষণা করা নয়, এমনকি বহু পাখির গান সত্যিকারের শুনতে পাওয়াও অত সোজা নয়। যেমন ধর, সাধারণ ভরতপাখি। কেউ যদি তাকে দেখে নাও থাকে তবু ভরতপাখিদের গান সম্ভবত সকলেই শুনে থাকবে। বসন্তকালে এবং গ্রীষ্মকালের শুরুতে শহরের বাইরে, বনের ভেতরে ফাঁকা জায়গার মাথায় আকাশ-বাতাস তাদের কণ্ঠস্বরে রীতিমতো মুখরিত হয়ে ওঠে। ভরতপাখিকে দেখতে পাওয়া বড় সহজ নয় — ছোটখাটো পাখি, ছাইরঙা, মাটিতে তাকে চোখে পড়ে না। শূন্যেও সে দ্রুত চোখের আড়াল হয়ে যায় — ভরতপাখিরা ১০০-১২০ মিটার পর্যন্ত উঁচুতে ওঠে। অত দূর থেকে তাকে একেবারেই ভালো করে দেখতে পারা যায় না। কিন্তু তার চেয়েও কঠিন হল ভরতপাখির কূজন নিয়ে অনুসন্ধান করা। নিছক শুনতে পাওয়া নয়, যাকে বলে অনুসন্ধান করা আর কি — কেননা এই পাখি সেকেণ্ডে ১৩০ ধরনের পর্যন্ত আওয়াজ ছাড়ে!

মুরগীর ছানা

সাহায্য করল যন্ত্রবিজ্ঞান — বিশেষ ধরনের যন্ত্রপাতি, টেপ-রেকর্ডার — আর বলাই বাহুল্য, বিজ্ঞানীদের একনিষ্ঠা, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব।

এখন লোকে জানে যে প্রত্যেক পাখিরই জীবনের সকল ঘটনার জন্য অসংখ্য সঙ্কেতধ্বনি আছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, যেমন 'পারিবারিক কথাবার্তা' চালানোর জন্য তেমনি 'অপরিচিত মহলে কথাবার্তার' জন্য ফিঞ্চ পাখি প্রায় তিরিশ রকমের আওয়াজ করতে পারে... আর হাঁস পারে বিশ রকমেরও বেশি। দেখা যাচ্ছে পাখাওয়ালাদের জীবনে কণ্ঠস্বরের ভূমিকা বিরাট — কেননা পাখির ঘ্রাণশক্তি বড় দুর্বল, সে ঘ্রাণ উপলব্ধি করতে পারে না। বহু প্রাণীর ক্ষেত্রে এই ঘ্রাণ তাদের চক্ষু-কর্ণের বদলে কাজ

মুরগী
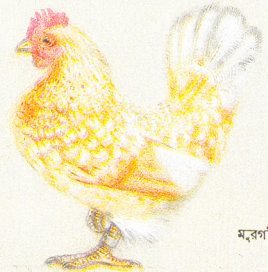
করে, অন্তত পক্ষে তাদের শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তির ভালোমতো অনুপূরক ত হয়ই। পাখির কাছে আওয়াজ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রায়ই সে

দৃষ্টিশক্তির চেয়েও আওয়াজকে বেশি বিশ্বাস করে। এমন একটি ঘটনা ঘটেছিল: এক শিকারী পাখি-ভুলানো ভেঁপুর সাহায্যে বটেরপাখিদের লোভ দেখিয়ে ডেকে আনছিল — পাখি-ভুলানো ভেঁপু স্ত্রী-বটেরের আওয়াজের মতো আওয়াজ ছাড়ে — বটেরপাখিও ঐ আওয়াজ লক্ষ্য করে আসতে থাকে। এমন সময় শিকারী মাথায় প্রচন্ড আঘাত অনুভব করল। শীতের মোটা টুপি মাথায় না থাকলে সে হয়ত জ্ঞান হারিয়ে ফেলত, জানতেই পারত না কে তাকে আক্রমণ করেছে। কিন্তু টুপির ফলে আঘাতটা কম হল, শিকারী আক্রমণকারীকে দেখতে পেল: আক্রমণকারী ছিল বটের-শিকারী বাজপাখি। শিকারী-পাখিটি দেখেছে যে তার সামনে বটেরপাখি নেই। কিন্তু সে বটেরের কণ্ঠস্বর শুনতে পায় এবং দৃষ্টিশক্তির চেয়ে নিজের শ্রবণশক্তিকে বেশি বিশ্বাস করে।

অবশ্য কেবল বুনো পাখিরাই যে দৃষ্টিশক্তির চেয়ে শ্রবণশক্তিকে বেশি বিশ্বাস করে তা নয়।

মুরগী — মা হিশেবে ভালোই, তার বাচ্চারা — মায়ের বাধ্য। মুরগী তার বাচ্চাদের চোখের আড়াল করে না, বাচ্চারাও মায়ের ডাক শোনামাত্রই তার দিকে ছুটে যায়। কিন্তু তাদের পক্ষে কোনটা বেশি গুরুত্বপূর্ণ — মাকে দেখতে পাওয়া না তার কণ্ঠস্বর শুনতে পাওয়া?

ঠিক হল যাচাই করে দেখতে হবে। ডিমে তা দিয়ে বাচ্চা ফুটিয়েছে এমন মুরগীকে এক জায়গায় রাখা হল, বাচ্চাদের রাখা হল অন্য এক জায়গায়। তারা একে অন্যকে দেখতে না পেলেও শুনতে পাচ্ছিল, কেননা মুরগীর সামনে রাখা হয়েছিল মাইক্রোফোন আর যেখানে বাচ্চারা ছিল, সেখানে রাখা হয় লাউড-স্পীকার। মুরগীটা মাইক্রোফোনের সামনে ছুটোছুটি করে ডাকতে থাকে তার বাচ্চাদের (সে অবশ্য বুঝতে পারছিল না যে রেডিও মারফত তার কণ্ঠস্বর চলে যাচ্ছে)। বাচ্চারাও মা'র কণ্ঠস্বর শুনতে পেয়ে লাউড-স্পীকারের দিকে ছুটে যায়। বাচ্চারা মাকে দেখতে পাচ্ছে না, অথচ তা সত্ত্বেও তার ডাকে এমনভাবে ছুটছে যেমন ছুটত

গাংচিল

মা-মুরগীকে দেখতে পেলে। তার মানে, দৃষ্টিশক্তির চেয়ে আওয়াজের ওপর তাদের আস্থা বেশি।

আরও একটি পরীক্ষায় এর সমর্থন মিলল। একটি স্বচ্ছ শব্দরোধী ঢাকনার নীচে এক মুরগীছানাকে বসিয়ে দেওয়া হল। মুরগী তাকে দিব্যি দেখতে পাচ্ছিল। কিন্তু যেহেতু তার চিৎকার শুনতে পাচ্ছিল না সেই হেতু তার দিকে মনোযোগ দিল না।

পাখিরা যে-সমস্ত আওয়াজ বার করে সেগুলি যে বিশেষ বিশেষ সংকেত সে বিষয়ে এখন আর কেউ সন্দেহ প্রকাশ করে না। এখন যা গুরুত্বপূর্ণ তা হল এই সংকেতগুলি নিয়ে অনুসন্ধান করা, তাদের অর্থোদ্ধার করা।

পাখিদের ভাষা সম্পর্কে আমরা ইতিমধ্যে খানিকটা জেনেছি। যেমন, আমরা জানি যে পাখিরা বিপদ সম্পর্কে একে অন্যকে সতর্ক করে দেয়, বিপদ-সংকেত পাঠায়। যে পাখি প্রথমে বিপদ লক্ষ্য করেছে সে অবিলম্বে বিশেষ ধরনের সংকেতের সাহায্যে বাদবাকিদের তা জানিয়ে দেয়, আর তারাও তৎক্ষণাৎ গাছপালার পাতার আড়ালে অথবা ঘাসের মধ্যে গা ঢাকা দেয়।

আচ্ছা বেশ ত, ঘাসের ভেতরে গা না হয় ঢাকা দিল। বাজপাখি বা চিল দেখা দিলে এটা উপযুক্ত জায়গা ঠিকই। কিন্তু পাখিদের বিপদ ত কেবল আকাশেই নয় — মাটিতেও তাদের কম শত্রু নেই। ধর না যদি

খেঁকশিয়ালীই গুঁড়ি মেরে আসে, আর পাখিরা বিপদ-সংকেত পেয়ে ঘাসের ভেতরে ডুব দেয়, তার মানে তারা সোজা গিয়ে পড়বে খেঁকশিয়ালীর মুখে? না, সে রকম ঘটে না, কেননা শেয়ালের আবির্ভাব ঘটলে মাটিতে বসে-থাকা পাখিরা গাছে উড়ে যায়, ঘাসের ভেতরে আত্ম-গোপনের চেষ্টা পর্যন্ত করে না। আর বাজপাখির আবির্ভাব ঘটলে সঙ্গে সঙ্গে আত্মগোপন করে।

স্টার্লিং

দেখা যাচ্ছে পাখিদের বিপদ-সংকেত সাধারণভাবে বিপদ-সংকেত নয়, তা হল একেবারে সঠিক সংকেত: 'বিপদ ওপর থেকে!' কিংবা 'বিপদ নীচ থেকে!' যেমন শ্যামা-দোয়েল জাতের পাখিরা ওপর থেকে বিপদ দেখা দিলে তার বার্তা জানায় 'সিই-ই' — এই রকম টানা আওয়াজ ক'রে। আর মাটিতে বিপদ দেখা দিলে উড়ে যাওয়ার নির্দেশ দেয় 'টিক্‌স-টিক্‌স' আওয়াজ ক'রে।

পরন্তু, এই নির্দেশগুলি এ জাতের সমস্ত পাখি কঠোরভাবে পালন করে থাকে। এমনকি পাখির ছানারাও বিপদসূচক চিৎকার শুনতে পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে চিঁচিঁ আওয়াজ থামিয়ে দেয়, মাথা হেঁট করে পরস্পর গায়ে-গায়ে লেপ্‌টে থাকে। কিন্তু তাই বলে এমন মনে করা উচিত হবে না যে এই বার্তাপ্রেরণ সচেতন। না দোয়েল বা শ্যামা, না অন্য কোন পাখি সচেতনভাবে কাউকে সতর্ক করে দেয় না। বিপদের মুহূর্তে তারা তাদের সগোত্রীয়দের কথা ভাবে না। তারা যদি একেবারে একা একা থাকত তাহলেও এই আওয়াজ করত (এবং করেও)। অপ্রত্যাশিত কোন কিছু দেখতে পেলে কিংবা কোন কারণে ভয় পেলে তোমরা যেমন নিজের অজানতেই চেঁচিয়ে বলে ওঠ 'ওঃ!' ওদের ব্যাপারটাও তেমনি। বাদবাকি আর সব আওয়াজও — তা পাখিদের জীবনে যত বিরাট ভূমিকাই গ্রহণ করুক না কেন — সচেতন নয়; মানুষের শিসধ্বনির ভাষা — সিল্‌বো, যার কথা এ বইয়ের একেবারে গোড়ায় তোমাদের বলেছি, তার মতো আদৌ নয়।

বেড়াল

অবশ্য বিপদ-সংকেতই যে পাখিদের একমাত্র সংকেত তা নয়। যাযাবর পাখিদের পুরুষ জাতিরা স্ত্রী-পাখিদের আগে দক্ষিণ থেকে উড়ে আসে। সঙ্গে সঙ্গে ভাবী পরিবারের বাসস্থানের ব্যাপারে যত্ন নেয়। ওদের এক জন হয়ত বাসোপযোগী কোটর পেয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে শুরু করে দিল গান। অবশ্যই অনুমান করা যেতে পারে যে সে গান ধরেছে এই

আনন্দে যে তার নতুন ফ্ল্যাট আছে, কঠিন কাজ শেষ হয়েছে, এখন বিশ্রাম করা যেতে পারে, ফাঁক পেয়ে একটু গান গাওয়া যেতে পারে। কিন্তু স্ত্রী-পাখির কাছে এ হল নির্দিষ্ট সংকেত, বার্তা: উপযুক্ত পাত্র আছে।

চড়াই

পাত্রের ফ্ল্যাট আছে। স্ত্রী-পাখি শিস অনুসরণ করে ওড়ে। পাখিদের যদি একসঙ্গে বাসা বাঁধতে হয় তাহলে নির্দিষ্ট সংকেতের সাহায্যে তারা একে অন্যের সন্ধান পেয়ে থাকে।

আবার দেখ স্টার্লিংয়ের জন্য গাছের ওপর তৈরি করে দেওয়া কাঠের বাক্সের সামান্য তফাতে বসে স্টার্লিং পাখি তারস্বরে গান গাইছে। ওকে একটু লক্ষ্য করে দেখ। বসে বসে গান গাইছে। নিজের গান, না অন্যের কাছ থেকে 'ধার করা' গান সেটা বড় কথা নয়। কিন্তু গাইছে কিসের জন্য? বাসার সন্ধান সে পেয়েছে, সঙ্গিনীটি ডিমে তা দিচ্ছে। তা সত্ত্বেও স্টার্লিং যে কিছুই করার নেই বলে গান গাইছে এমন নয়। সে সবাইকে জানিয়ে দিচ্ছে যে এই জায়গাটার দখল নেওয়া হয়ে গেছে, এখানে বাইরের কারও নাক গলানো ঠিক হবে না।

কিন্তু তা সত্ত্বেও উট্‌কো কেউ যদি এখানে উড়ে আসে, তাহলে শুনতে পাবে স্টার্লিং পাখির সুরের পরিবর্তন, সে গানের সুর হবে কঠোর, তাতে থাকবে বেহায়াটার প্রতি সতর্কবাণী। সতর্কতা উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে স্টার্লিং অনাহূত আগন্তুকটিকে তাড়া করবে, তাকে খেদিয়ে দেবে — এমনকি ঐ পাখিটা যদি তার চেয়ে শক্তিশালীও হয়। আবার, স্টার্লিং হয়ত তোমাকে দেখতে পেল। আবার গানের সুর বদলে গেল। এবারে কিন্তু একেবারেই অন্য গান। বেড়ালের আবির্ভাব ঘটল — স্টার্লিংয়ের কণ্ঠেও ধ্বনিত হল নতুন সুর। ফাঁদে পড়লে স্টার্লিং বিপদ-সংকেত পাঠায়, অথবা আতঙ্কে চেঁচিয়ে ওঠে। সঙ্গে সঙ্গে গোটা ঝাঁকটা — যদি ধারে কাছে থাকে — চটপট ঐ জায়গা ছেড়ে দূরে উড়ে যাবে। এক্ষেত্রেও বলতে হয় যে স্টার্লিং কিংবা অন্য কোন পাখিরই মতলব নয় কাউকে সতর্ক করে দেওয়া, সে নেহাৎই নিজে মারাত্মক ভয় পেয়ে গেছে এবং আতঙ্কে চেঁচাচ্ছে।

মাত্র এক-আধঘণ্টা স্টার্লিংদের লক্ষ্য করে দেখ, পাখির মুখের কত শব্দই না শুনতে পাবে! সেখানে আছে হুঁশিয়ারি: 'এটা আমার জায়গা!' আছে হুমকি: 'কেটে পড়, নইলে ভালো হবে না কিন্তু!' আছে বিপদ-সংকেত — পরন্তু, সম্পূর্ণ যথাযথ: 'মাটিতে সন্দেহজনক দু'পেয়ে কী একটা দেখা যাচ্ছে!' (তোমাকে যদি দেখতে পায়) কিংবা 'চারপেয়ে শিকারী জন্তু গাছে উঠছে, বাসার কাছাকাছি এগিয়ে আসছে!' (বিড়ালের কথা হচ্ছে)। হয়ত 'আপন প্রাণ বাঁচা!' — এই সংকেতও তুমি শুনতে পাবে (স্টার্লিং যদি বিপদে পড়ে)। এই সব সংকেত যে কেবল স্টার্লিংদের লক্ষ্য করলেই শুনতে পাবে তা নয়। এমনকি সাধারণ চড়াইপাখিও নিজের সম্পর্কে কৌতূহলোদ্দীপক অনেক কিছু বলবে।

যেমন, অনেকেই জানে না যে শত্রুকে হুমকি দিতে গিয়ে চড়াইপাখি কুকুরের গর্জনের মতো (বলাই বাহুল্য, কেবল অনেক মৃদুস্বরে) ধমক

দেয়, কিংবা এক কণা রুটির সন্ধান পেয়ে হঠাৎ জোরে কিচিরমিচির করতে থাকে, যেন গোটা ঝাঁককে ডাকতে চায়। ঝাঁক সত্যি-সত্যিই উড়ে আসে, আর ঐ চড়াইটার খাবার অনেক সময়ই হাতছাড়া হয়ে যায় — বেশি চটপটে পাখিরা তার কাছ থেকে রুটির কণা কেড়ে নেয়।

লোকে দীর্ঘকাল অবধি বুঝে উঠতে পারত না কেন চড়াই কোন কিছুর সন্ধান পেলে চেঁচায়। হ্যাঁ, খাবার যদি দেদার থাকে তাহলে বোঝা যায়। কিন্তু সে যখন যৎসামান্য খাবারের সন্ধান পায় তখনও চেঁচায়!

এই একই ব্যাপার দেখতে পাবে মুরগীদের বেলায়। খাওয়ার উপযোগী কিছুর সন্ধান পেলে মুরগী ক'ক্-ক'ক্ শুরু করে দেয়। মনে হয় সে যেন তার বান্ধবীদের ডাকছে। বান্ধবীরাও সত্যি-সত্যিই ছুটে আসে। সন্ধানপ্রাপ্ত খাবার যদি অল্পও হয় — তার নিজেরই যদি না কুলোয় — তবু মুরগী ক'ক্-ক'ক্ করে। কেন?

মোসন্ধানী পাখি

মুরগী আর চড়াইদের আচরণ আপাত দৃষ্টিতে কান্ডজ্ঞানবর্জিত বলে মনে হয়: নিজেরই খাবার জোটে না আবার জ্ঞাতি-কুটুম্বদের ডাকা হচ্ছে!

হ্যাঁ, পাখিদের আচরণ সত্যি-সত্যিই 'কান্ডজ্ঞানবর্জিত'। কিন্তু ওদের এই রীতি আবহমানকাল ধরে চলে আসছে। আর হয়ত এই কারণেই পৃথিবীতে ওদের অস্তিত্ব বজায় আছে।

পাখিদের পেট চালান সচরাচর বড় দায়। ওদের খিদে দারুণ, অথচ খাবার, বিশেষত শীতকালে, কম। ঠান্ডায় আর খাদ্যাভাবে খুদে জাতের একশ'টি পাখির মধ্যে প্রায় নব্বইটি মারা যায়! সম্ভবত আরও বেশি সংখ্যক পাখি মারা যেত যদি 'খাদ্য সম্পর্কিত কথাবার্তা' তাদের সাহায্য না করত। পাখিরা সারা দিন খাদ্যের সন্ধানে ঘুরঘুর করে, অথচ শীতকালে, বুঝতেই পারছ, না আছে পোকা-মাকড়, না বীজ, না ঘাস, না খুদে ফল। তায় আবার শীতকালে দিন ছোট। হয়ত দেখা গেল একটা পাখির কপাল ভালো — সে খাবারের সন্ধান পেয়েছে। সে যদি খাবারটা একা খেয়ে ফেলে তাহলে বাদবাকিদের অবস্থা কাহিল হবে। এমনও হতে পারে যে তাদের অনেকে আগামীকাল পর্যন্ত বাঁচবেই না — ঠান্ডায় সিঁটিয়ে যাবে। (কেননা ক্ষুধার্ত পাখি সামান্য হিমেই মারা যেতে পারে, কিন্তু যার ভরপেট তার কাছে প্রবল হিমও তেমন ভয়াবহ নয়!) তাছাড়া এই স্বার্থপরটাকে পরে হয়ত কেউই সাহায্য করত না, সে মারা যেত। কিন্তু পাখিদের মধ্যে 'স্বার্থপর' কেউ নেই: একজন খাদ্যের সন্ধান পেলে বাকি সবাইকে জানায়। খাবার কম হলেও কিছু আসে যায় না — সে বাদবাকিদের ডাকবেই, কেননা এখানে যে খাবার আছে তাতে সকলের কুলোবে কি না পাখিরা বুঝে উঠতে পারে না।

আমাদের অঞ্চলে যে-সমস্ত পাখি শীত কাটায় কেবল তাদের মধ্যে নয়, আরও বহু পাখির মধ্যে খাবারের জন্য এমন বা অনেকটা এরকম ডাকের চল আছে।

ব্যাজার (গেছো নেউল)

প্রসঙ্গত, এমন পাখিও আছে যাঁরা খাবারের জন্য ডাকের মধ্যে অসাধারণত্ব প্রকাশ পায়।

এই পাখি মধু খেতে বড় ভালোবাসে। সে বন্য মৌমাছিদের বাসা দিব্যি খুঁজে বার করে, অথচ মৌমাছিদের ডরায়। তাই সে তার ভাগীদারের খোঁজ করতে থাকে। মানুষ, ভালুক কিংবা গেছো নেউলকে দেখতে পেলে এমন চেঁচামেচি শুরু করে, এমন অর্থপূর্ণ হাঁকডাক ছাড়তে থাকে যে তার কথা না বোঝার কোন উপায় থাকে না। পাখি মানুষকে কিংবা

জন্তুকে মৌমাছিদের কাছে নিয়ে আসে এই উদ্দেশ্যে যাতে তারা মধু সংগ্রহ করে। কিন্তু এতে তার লাভটা কী? মধুর ভাগ ত আর সে পাবে না। কিন্তু না, দেখা যাচ্ছে কিছু একটা জুটেছে — সে খেতে পায় ঝড়তি-পড়তি অংশ আর মধুকোষ।

খয়েরি তিতিরের ছানা

এরকম কার্যকলাপের জন্য পাখিটার নাম দেওয়া হয়েছে মৌসন্ধানী।

মা-বাবারা যাতে বাচ্চাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে পারে তার জন্য পাখিদের শব্দভাণ্ডারে অনেক বিশেষ বিশেষ শব্দ আছে। কখনও কখনও এই সংকেতগুলি পক্ষিশাবক জন্মগ্রহণের আগেই শুরু হয়ে যায় — যেমন, মুরগীদের ক্ষেত্রে, ছানারা যখন ডিমের ভেতরে থাকে তখনই সংকেত পাঠায়। সম্ভবত এই সংকেতের সাহায্যে তারা মাকে আগে থেকে জানিয়ে দেয়: আমাদের গ্রহণ করার জন্য তৈরি হও। তাদের কেউ কথা বলার জন্য তালিম দেয় না, তারা সংকেত পাঠানোর এবং বোঝার ক্ষমতা নিয়েই জন্মায়।

মুরগীর ছানারা ডিম ফুটে বেরোবার সঙ্গে সঙ্গে ক্ষীণকণ্ঠে চিঁচিঁ আওয়াজ করে মার পেছন পেছন ছুটতে থাকে। তারা যেন মাকে বলে: আমরা সব ভালো আছি। দেখতে দেখতে জোরাল, একটানা চিঁচিঁ আওয়াজ উঠল, মুরগীটা উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ল: একটা ছানার কী যেন হয়েছে। কখনও কখনও এমন হয় যে মা হয়ত বেশ জোরে ছানাকে চাপ দিয়েছে কিংবা হয়ত বা তাকে মাড়িয়েই দিয়েছে, তখন ছানার করুণ আর্তনাদ শুনে সে উদ্বিগ্ন হয়ে এদিক-ওদিক তাকাতে থাকে।

কোন কোন মা যখন দেখে যে বাচ্চারা জলে নামতে কিংবা বাসা ছেড়ে উড়তে ভয় পাচ্ছে তখন বিশেষ সংকেতের সাহায্যে তাদের উৎসাহ দিয়ে থাকে। কালো তিতির বা খয়েরি তিতিরের ছানারা ঘাসপাতার মধ্যে পথ হারিয়ে ফেললে তাকে এই 'জঙ্গল' থেকে বার করে আনার দাবি জানিয়ে জোরে চিঁচিঁ করতে থাকে।

ক্ষুধার্ত পক্ষিশাবকরাও জোর গলায়, তবে সুর পালটে চেঁচিয়ে মা-বাবার কাছ থেকে খাবার দাবি করে।

খয়েরি তিতির

বসন্তকালে আমাদের এখানে পাখিরা উড়ে আসে। ছোট ছোট পাখিরা উড়ে আসে অলক্ষিতে। কিন্তু বড় জাতের পাখিরা অনেক সময় রাতের বেলায় উড়লেও জোরাল আওয়াজ করে। অর্থাৎ দলপতি সংকেত দিচ্ছে: পিছিয়ে পড়ো না, আমার পেছন পেছন এসো।

এছাড়া আরও সংকেত আছে, যেগুলি এখন লোকের কাছে পরিচিত। কিন্তু সে হল পাখিদের কথাবার্তার একটা সামান্য অংশ মাত্র; কেননা পাখিদের ভাষায় শব্দ আছে ডজন-ডজন, এমনকি শত-শত (যেমন, আমাদের সারসদের দক্ষিণ আমেরিকাবাসী জ্ঞাতি — কারিয়ামা মানুষের

কুমীর

কানে পার্থক্য ধরার মতো দু'শ রকমের পর্যন্ত আওয়াজ বার করে)। আর বিবিধ বিন্যাসে তা দাঁড়ায় হাজার হাজার সংকেতে!

কিন্তু দেখা যাচ্ছে এটাও সব নয়। আমরা পাখিদের মুখ থেকে নানা রকমের হাজার হাজার আওয়াজ শুনতে পাই। পাখিরা নিজেরা শুনতে পায় তার অনেক বেশি: অনেক পাখি এমন সমস্ত 'শব্দ' উচ্চারণ করে যেগুলি মানুষের কানে যায় না।

পাখিদের কথাবার্তার উপর অনুসন্ধান চালাতে গিয়ে বিজ্ঞানীরা আরও অসংখ্য প্রশ্নের সম্মুখীন হন। যেমন একটি প্রশ্ন।

শিকারীরা ম্যাগপাই পাখিদের একেবারে সহ্য করতে পারে না। তারা মনে করে যে এই পাখির তীব্র কর্কশ চিৎকারে শিকার নির্ঘাত পণ্ড হয়ে যাবে — কেননা ম্যাগপাই নাছোড়বান্দার মতো শিকারীকে অনুসরণ করে চলে আর সারাক্ষণ চেঁচায়।

লোকে লক্ষ্য করে দেখেছে যে কখনও কখনও হিংস্র জন্তু-জানোয়ার যখন শিকারের জন্য বেরোয় তখনও ম্যাগপাই চেঁচাতে চেঁচাতে তাদের সঙ্গে সঙ্গে চলে। ম্যাগপাই যে চিৎকার-চেঁচামেচি করে জন্তু-জানোয়ার ও পাখিদের ভয় পাইয়ে দেবে এটা তেমন বিশ্বাসযোগ্য নয়। তার মানে সে বিপদের সংকেত দেয়। আর সে সংকেত গ্রহণ করে... না, কেবল ম্যাগপাইরাই নয়। দেখা যাচ্ছে অন্যান্য পাখিরাও, এমনকি পশুরাও ম্যাগপাইয়ের ভাষা বোঝে।

প্রকৃতিতে এ ধরনের বহু দৃষ্টান্ত আছে।

এক জাতের ছোট পাখি আছে যার সঙ্গে কুমীরের ভারী ভাব। ভরপেট খাওয়ার পর কুমীর জলাশয়ের ধারে বালির ওপর হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়ল, পরিতৃপ্তিতে হাঁ করে ঝিমুতে থাকল। সঙ্গে সঙ্গে পাখিও হাজির — সাহস করে কুমীরের হাঁ-করা মুখের ভেতরে লাফিয়ে পড়ল, কুমীরের দাঁতের ফাঁকে ফাঁকে খাবারের যে-সমস্ত অবশিষ্টাংশ বেধে রয়েছে তা খুঁটে খুঁটে বার করতে লেগে গেল। এমন সময় পাখি দেখতে পেল শিকারী ঘুমন্ত কুমীরের দিকে সন্তর্পণে চুপিসারে এগিয়ে আসছে। তৎক্ষণাৎ শোনা গেল অনুচ্চ অথচ কর্কশ সংকেত। বিদ্যুৎগতিতে কুমীর চোখ খুলল, এক সেকেন্ডের মধ্যে সে নেমে গেল জলে। পাখি বিপদ-সংকেত জানাল, কুমীর তা বুঝতে পারল।

পানকৌড়ি (করমোরান্ট)

আরও একটি দৃষ্টান্ত। সীল তার জীবনের শঙ্কা না করে নিশ্চিন্তে ঝিমোয় যদি পাশে থাকে পানকৌড়িরা। কিন্তু হঠাৎ উঠল পানকৌড়িদের জোরাল চিৎকার — ওরা বিপদ দেখতে পেয়েছে। সীলও অবিলম্বে জলের তলায় চলে গেল, যদিও পানকৌড়িরা, বলাই বাহুল্য, সীলকে সতর্ক করে দেওয়ার কথা ঘুণাক্ষরেও ভাবে নি।

এরকম বহু দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে যেক্ষেত্রে এক জাতের জীব-জন্তু অন্য জাতের জীব-জন্তুর বিপদ-সঙ্কেতে সাড়া দেয় এবং সে সঙ্কেত মেনে চলে।

সম্প্রতি জানা গেছে যে কোন কোন ক্ষেত্রে বিভিন্ন জাতের পাখিরা কেবল যে পরস্পরকে বুঝতেই পারে তা নয়, একই রকম কথাবার্তাও বলে। শব্দগ্রাহী যন্ত্রে ধরা পড়েছে যে পেঁচাকে দেখতে পেয়ে বিভিন্ন জাতের খুদে পাখিরা প্রায় একই ধরনের আওয়াজ করে।

এর উল্‌টোটাও হয়: একই জাতের পাখিরা একে অন্যকে বুঝতে পারে না। বিভিন্ন দেশে অথবা বিভিন্ন অঞ্চলে বসবাসকারী দাঁড়কাক, পাতিকাক, ফিঞ্চ, শঙ্খচিল, স্টার্লিং এবং অন্যান্য পাখিদের নিয়ে বেশ কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়। তাতে প্রকাশ পেল বিস্ময়কর তথ্য: ফ্রান্সে বসবাসকারী দাঁড়কাকরা ইংলন্ডে বসবাসকারী আপন জ্ঞাতিদের ভাষা বুঝতে পারে না, আবার মস্কোবাসী ফিঞ্চরা (মস্কোর উপকণ্ঠবর্তী বনে এদের বাস) উরালের ফিঞ্চদের থেকে সম্পূর্ণ অন্য ধরনে কথাবার্তা বলে। সমুদ্রের এক উপকূলে যে শঙ্খচিলরা নীড়-বেঁধে থাকে তারা ঐ একই সমুদ্রের অন্য উপকূলে নীড়-বাঁধা শঙ্খচিলদের ভাষা বুঝতে পারে না। শীতকালীন বাসের সময় দেখা-সাক্ষাৎ হলে বিভিন্ন দেশ থেকে আগত স্টার্লিং পাখিদের ঝাঁক 'দেশবাসী-সমিতি' গড়ে তোলে, যেহেতু কেবল এক দেশ থেকে উড়ে আসা স্টার্লিংরাই নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বলতে পারে। এমন কেন হয় তার ব্যাখ্যা আপাতত মেলে নি।

পেঁচা

আরও একটি কৌতূহলজনক তথ্য: সম্পূর্ণ পৃথক পৃথক জাতের পাখিদের গানের সুরে মিল থাকলেও থাকতে পারে, কিন্তু পাশাপাশি বসবাসকারী নিকট জ্ঞাতিদের গানে রীতিমতো তফাত দেখা যায়। যেমন শ্যামা ও দোয়েল পাখির অথবা পাঁশফুটকি ও টুনটুনি পাখির গান। এদের বাইরের চেহারায় অনেক মিল, অথচ এদের গানের মধ্যে বিন্দুমাত্র মিল নেই (কেবল সমস্ত গায়কপাখিদের সাধারণ বৈশিষ্ট্য — হ্রস্বমাত্রার ঝঙ্কার ছাড়া)। গানের সুরের তফাত এখানে খুবই গুরুত্বপূর্ণ, তা যেন পাখিদের ইঙ্গিতে বলে দেয়: 'আমি তোমাদের আপনজন' অথবা: 'আমি দেখতে এক রকম হলেও আসলে অন্য জাতের'। ফলে চিনতে কোন ভুল হয় না।

বানর আশ্চর্য হয়ে অচেনা গোলাকার বস্তুটার দিকে তাকিয়ে দেখল, সন্তর্পণে সেটাকে হাতে তুলে নিল, ঘোরাল, শুঁকে দেখল, তারপর বল্-এর মতো মেঝেতে গড়িয়ে দিতে লাগল। কিন্তু লাল রঙের গোলাকার বস্তুটা হঠাৎ **'নষ্ট হয়ে গেল'** — একটা ভিজে ধ্যাবড়া পিণ্ডে পরিণত হল। বানরটা অবাক দৃষ্টিতে তার নোংরায় মাখামাখি হাতের দিকে তাকাল, ঘৃণাভরে হাত মুছল। তারপর এদিক-ওদিক তাকাতে দেখতে পেল যে খাঁচার ভেতরে হুবহু ঐ রকম আরও একটা বস্তু দেখা দিয়েছে। এবারেও সে ওটা নিয়ে খেলার চেষ্টা করল।

যে-সমস্ত লোকজন খাঁচার পাশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বানরকে লক্ষ্য করছিল তারা মুখ চাওয়া-চাওয়ি করল: কী করা যায়? টমেটো কাকে বলে এই বানরটা যদি জীবনে কখনও তা না দেখে থাকে, না জানে, তাহলে তাকে কী করে তা খাওয়ানো যায়? অথচ টমেটো বানরের বড় দরকার — কেননা তার মধ্যে আছে তার প্রয়োজনীয় ভিটামিন, যার অভাবে সে অসুস্থ হয়ে পড়বে। এদিকে বানর কিছুতেই টমেটো খেতে চাইছে না। হয়ত টমেটো সে খেতও, কিন্তু সে আসলে জানেই না যে এই লাল গোলাকার বস্তুটি খাদ্যোপযোগী।

তখন লোকে ঐ খাঁচায় আরেকটা বানরকে পুরে দিল। টমেটো পেতে না পেতেই এই বানরটা বুভুক্ষুর মতো তা খেতে শুরু করল, খেতে খেতে তারিফের ভঙ্গিতে জোর গলায় স্পষ্ট আওয়াজ করতে লাগল। প্রথম বানরটি অবাক হয়ে পড়শীটির দিকে তাকাল, পড়শী যখন দ্বিতীয় টমেটো পেয়ে একই রকম পরিতৃপ্তির সঙ্গে, একই 'আঃ' আওয়াজ করতে করতে তা খেতে **শুরু করল** তখন প্রথম বানর থেঁতলানো টমেটোটার দিকে এগিয়ে এলো এবং সন্তর্পণে সেটা ঠোঁটে ঠেকাল। টমেটো-ভক্তটি যত বেশি 'আঃ-আঃ' করতে থাকে, আনাড়ি বানরটিও তত বেশি সাহস করে খেয়ে চলে। অবশেষে এমন একটা সময় এলো যখন স্পষ্টই পরিতৃপ্তির সঙ্গে এই 'বস্তুটি' গ্রহণ করল। এটাকে এখন আর তার বুঝতে বাকি নেই।

লোকে খাঁচার কাছ থেকে সরে গেল। এখন তারা জানে যে আনাড়ি বানরটা টমেটো খাবে। সে নিজে অর্থব্যঞ্জক 'আঃ-আঃ' করে একথা তাদের 'বলেছে'।

'আঃ-আঃ' আওয়াজের তাৎপর্য কী, এর কোন অর্থ আছে কিনা কিংবা এটা নেহাৎই আপাতিক আওয়াজ — বিজ্ঞানীরা তা চট করে বুঝে উঠতে পারেন নি। অবশ্য প্রকৃতিতে আপাতিক বলে কিছু নেই। কিন্তু কী ভাবে যাচাই করা যায়?

একটা বানর ভাতের পরিজ বড় ভালোবাসত। তাকে প্রতিদিন তা দেওয়া হতে লাগল। সকালে, দুপুরে, সন্ধ্যায় — সবসময় তাকে দেওয়া হতে লাগল ভাতের পরিজ। প্রথম প্রথম বানর পরম পরিতৃপ্তির সঙ্গে জোর গলায় 'আঃ-আঃ' আওয়াজ করে পরিজ খেয়ে চলল। কিন্তু ধীরে ধীরে 'আঃ-আঃ' আওয়াজ মৃদু হয়ে এলো, পরে একেবারে বন্ধ হল। বানর এখন আর পরিজ দু'চক্ষে দেখতে পারে না — মুখ ঘুরিয়ে নেয়, কিংবা সামনের দিকে দু'হাত বাড়িয়ে যেন একঘেয়ে খাবারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানায়। ওকে যদি জোর করে খাওয়ানোর চেষ্টা করা হত তাহলে ও পরিজ মুখে দিত, কিন্তু গিলত না। বানরের অবস্থাটা বোঝা যায় — রোজ রোজ তাকে একই খাবার দেওয়া হচ্ছে, এতে প্রিয় খাদ্যেও বিরক্তি ধরে যাওয়ার কথা! কিন্তু যেটা বোঝা যায় না তা হল এই যে পরিজে পুরোপুরি বিরক্তি ধরে যাওয়ার আগেই সে কেন 'আঃ-আঃ' আওয়াজ বন্ধ করে দিল? এখানে কোনরকম যোগসূত্র আছে কি? এর ব্যাখ্যা পাওয়ার উদ্দেশ্যে পাশের খাঁচায় আরেকটা বানরকে রাখা হল। সেটাও ভাতের পরিজ খেতে ভালোবাসত, কিন্তু পরিজ তাকে দেওয়া হত কদাচিৎ। এই কারণে খাওয়ার সময় সে 'আঃ-আঃ' শুরু করে দিল। সঙ্গে সঙ্গে প্রথম বানরটির আচরণ পাল্‌টে গেল। এই মাত্র সে মরিয়া হয়ে পরিজের খপ্পর থেকে আত্মরক্ষা করছিল, আর এখন পড়শীকে 'আঃ-আঃ' করতে শুনে পরিজ খেতে শুরু করে দিল।

এবারে দুটি প্রশ্নের উত্তর দরকার: 'আঃ-আঃ' আওয়াজের অর্থ কী এবং অন্য বানরদের উপর তার এমন প্রতিক্রিয়া হয় কেন?

দেখা গেছে, বানরেরা যে খাওয়ার সময় সর্বদাই 'আঃ-আঃ' করে তা নয়, করে একমাত্র তখনই যখন মুখরোচক খাবার পায়। কতবারই না লক্ষ্য করে দেখা গেছে — খাঁচার ভেতরে দৈবাৎ এসে পড়া কোন বস্তুর সন্ধান পেলে বানর তা শুঁকে দেখবে, চিবুনোর চেষ্টা করবে, তারপর চুপচাপ থু থু করে ফেলে দেবে — বিস্বাদ! কিন্তু যেই সে আপেল কিংবা মিঠাই পেল অমনি শোনা যায় 'আঃ-আঃ' আওয়াজ। বানর যেন বলতে চায়: 'এই ত চাই, এই না হলে খাবার!' এর অর্থ হল বিজ্ঞানীরা যার নাম দিয়েছেন 'খাদ্যসংক্রান্ত' আওয়াজ, বানর সে আওয়াজ বার করে একমাত্র তখনই যখন খাদ্য তার পছন্দসই হয়। এমনও ত হতে পারে যে এটা নেহাৎই পরিতৃপ্তির অভিব্যক্তি? বানর খায় আর 'আওড়ায়'। অবশ্য সে কাউকে উদ্দেশ্য করে কিছু বলে না — নিছক আপন মনে কথা বলে। কিন্তু অন্যেরা ত তার এই নিনাদ শুনতে পায়। তাদের কাছে এ হল সংকেত: 'অবগতির জন্য জানাচ্ছি! এখানে খাদ্যের সন্ধান পাওয়া গেছে! জলদি ছোটে এসো!' তারাও ছোটে। যদিও অনেক সময়ই ছোটাটা নিষ্ফল হয়: হয়ত একটা বানর মিঠাই পেয়ে পরিতৃপ্তিতে 'আঃ-

আঃ' করছে; অন্যেরা তার তারিফ করা শুনতে পেয়ে তার দিকে ছুটে আসে, এসে দেখে খাবার শেষ! খাঁচার ভেতরে এই সংকেত বানরদের কাছে নিরর্থক, কেননা এখানে প্রত্যেকে যার যার ভাগ পায়। কিন্তু মুক্ত অবস্থায়, বনে ব্যাপারটা অন্য রকম। খাদ্যের সন্ধানে বানরের পাল গাছ থেকে গাছে ঘুরে বেড়ায়। কিন্তু খাবার নেই। এমন সময় একজনের ভাগ্য প্রসন্ন হল — সে মুখরোচক ফলের সন্ধান পেয়েছে। বলাই বাহুল্য, সে অবিলম্বে ফল খেতে শুরু করে দেয়। অন্য বানরেরা তাকে দেখতে পায় না। সম্ভবত তারা ক্ষুধার্তই থেকে যেত। কিন্তু বানরটা 'আঃ-আঃ' করতে থাকে — সঙ্গে সঙ্গে গোটা পাল এসে হাজির সেই গাছটায় যেখানে ফলের সন্ধান পাওয়া গেছে।

'খাবার' সংকেত বানরদের পক্ষে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তবে এই সংকেত অবশ্যই তাদের কাছে যথেষ্ট নয়। 'আঃ-আঃ' আওয়াজ অনাহারে মৃত্যুর কবল থেকে বানরদের বাঁচাতে পারলেও পদে পদে আরও অসংখ্য বিপদ তাদের জন্য ওত্ পেতে থাকে। পালের একটি বানর যেই বিপদ দেখতে পায় অমনি সে জোর গলায় 'হে-হে' হাঁক ছাড়ে। বানর এটাও বলে থাকে আপন মনে। কিন্তু বাদবাকিদের এর চেয়ে বেশি কিছু দরকার হয় না — মুহূর্তের মধ্যে গোটা পালের চক্ষু-কর্ণ সজাগ হয়ে ওঠে। আওয়াজ যদি আবার হয় অথবা আরও কেউ যদি বিপদ দেখে 'হে-হে' করে, তার মানে হল বিপদ এখনও কাটে নি, অর্থাৎ ব্যবস্থা অবলম্বন করা দরকার। সবচেয়ে সোজা কাজ হল পালানো। বানরেরা অধিকাংশ সময় এটাই করে থাকে। কিন্তু এমনও ঘটে যখন পালানোর কোন পথ নেই, কিংবা আর সময় নেই। তখন বানরেরা আত্মরক্ষার আয়োজন করবে। কিন্তু যুদ্ধে নামার আগে তারা সে সম্পর্কে নির্ঘাত 'বলবে'। আর তা বলবে কেবল বাইরের চেহারার সাহায্যে নয় — কেবল লোম খাড়া করে, চোখ লাল করে, দাঁত খিঁচিয়ে আর ঘুষি পাকিয়েই নয়। পেছনের দু'পায়ে ভর দিয়ে উঠে বানর শত্রুর মুখোমুখি হয়, জোরে জোরে

'উ-উ-উ' কিংবা 'আগ্-আগ্-আগ্' আওয়াজ করে। এর অর্থ মোটেই এমন নয় যে বানরেরা আওয়াজ করে শত্রুকে ভয় দেখানোর চেষ্টা করছে বা তাকে এই বলে সাবধান করে দিতে চাইছে যে 'কেটে পড়, নইলে ভালো হবে না বলছি!' কিন্তু ঘটনা এই যে এ আওয়াজ (বিজ্ঞানীরা এর নাম দিয়েছেন সক্রিয়-প্রতিরক্ষামূলক) শুনে শত্রু ভয় পেয়ে যেতে পারে। এ ধরনের আওয়াজ বানরদের নিজেদের পক্ষেও তাৎপর্যপূর্ণ — তাদের দলবদ্ধ হতে সাহায্য করে। মোটের উপর শব্দ-সঙ্কেতের গুরুত্ব তাদের কাছে সবচেয়ে বেশি বললেও চলে।

এক দিন গবেষণার উদ্দেশ্যে ল্যাবরেটরিতে শিম্পাঞ্জির রক্ত নেওয়া হচ্ছিল। ল্যাবরেটরি-কর্মী যখন শিম্পাঞ্জির আঙ্গুলে ছুঁচ ফুটিয়ে দিল তখন সে চেঁচিয়ে উঠল, তার গায়ের লোম খাড়া হয়ে উঠতে লাগল। সঙ্গে সঙ্গে স্পষ্ট বোঝা গেল — তাকে যে যন্ত্রণা দিয়েছে সেই 'দুষ্কৃতিকারীটিকে' সে শাস্তি দিতে চায়। দু-এক সেকেণ্ডের মধ্যে দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে: কেননা বয়স্ক শিম্পাঞ্জি যে-কোন মানুষের চেয়ে বেশি শক্তি ধরে। কিন্তু ঠিক এই সময় পাশে যে বিজ্ঞানীটি দাঁড়িয়ে ছিলেন তিনি তাড়াতাড়ি ল্যাবরেটরি-কর্মীর দিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে বিশ বার ছাড়া ছাড়া 'উ-উ-উ' আওয়াজ করে বিপদের সঙ্কেত উচ্চারণ করলেন। তৎক্ষণাৎ শিম্পাঞ্জিও অদৃশ্য শত্রুর উদ্দেশ্যে ধমকের সুরে চেঁচাতে লাগল। আসল 'দুষ্কৃতিকারীর' কথা সে সঙ্গে সঙ্গে ভুলে গেল।

দেখ, ব্যাপারটা কেমন কৌতূহলজনক: বানর যন্ত্রণা অনুভব করল এবং দেখতে পেল কে তার এই যন্ত্রণার কারণ। অথচ বিপদের সঙ্কেত শুনতে পাওয়া মাত্র সে তা ভুলে গেল। (যে বিজ্ঞানী এই আওয়াজ করেন তিনি বানুরে ভাষা ভালোমতো জানেন, তার যথাযথ প্রয়োগও জানেন।)

কিন্তু বানরেরা কেবল খায় না, শত্রুদের হাত থেকে কেবল নিজেদের প্রাণ বাঁচায় না কিংবা আত্মরক্ষা করে না। বানরদের পালের মধ্যে সর্বদাই অপেক্ষাকৃত শক্তিমান ও অপেক্ষাকৃত দুর্বল থাকে। এবারে মনে মনে কল্পনা কর — বানরের পাল কোথাও চলেছে। তাদের পথ হয়ত তেমন কাছের নয় — কখনও কখনও গাছ থেকে গাছে, ডাল থেকে ডালে লাফিয়ে লাফিয়ে, আর বেশির ভাগ সময়ই জমির ওপর দিয়ে তারা চলে, এই ভাবে তারা পার হয় বেশ কয়েক ডজন কিলোমিটার। অন্য যে-কোন দলের মতো তাদের দলেও শক্তিশালী ও দুর্বল — দুই শ্রেণীরই বানর থাকতে পারে। ঘন পাতার ভেতরে কিংবা গাছপালার আড়ালে, তায় আবার দ্রুত চলার সময় বানরেরা একে অন্যকে তেমন একটা দেখতে পায় না, কোন বানর নিদারুণ পরিশ্রান্ত, অবসন্ন হয়ে

পড়লে তাকে তারা লক্ষ্য নাও করতে পারে। সে দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে, তার সত্যিকারের মৃত্যুর আশঙ্কা দেখা দেয়। তখনই বানর সাহায্যের জন্য ডাকে — মিহিকণ্ঠে করুণ আর্তনাদ করে। বলাই বাহুল্য, এটা সচেতন ডাক নয়; দৃষ্টান্তস্বরূপ, আতঙ্কজনিত চিৎকার ও যন্ত্রণাকাতর চিৎকার যেমন, এও তেমনি। কিন্তু বাকি বানরদের কাছে এটাই যথেষ্ট — দলটা সঙ্গে সঙ্গে থমকে দাঁড়ায়।

একদিন আমরা লক্ষ্য করলাম একটা বড় খাঁচার ভেতরে দুটি বানর খেলা করছে — একটি পালাচ্ছে, অন্যটি তার নাগাল ধরার চেষ্টা করছে। যেটা পালাচ্ছিল সেটা সম্ভবত বেশি শক্তিশালী, সহনশীল গোছের ছিল, দ্বিতীয়টি তাই কিছুতেই তার বন্ধুর নাগাল ধরতে পারছিল না। অবশেষে হয়রান হয়ে গিয়ে সে থেমে গেল এবং টানা 'ই' ধ্বনির মতো ক্ষীণ আওয়াজ করল। প্রথমটি তৎক্ষণাৎ থেমে গেল, বন্ধুর দিকে এগিয়ে এসে তাকে জড়িয়ে ধরল। এই ভাবে একে অন্যকে জড়িয়ে ধরে তারা বসে রইল, যতক্ষণ না দুর্বল বানরটার জিরোন হল।

অবশ্য এখানে, খাঁচার ভেতরে বানরের বিপদের কোন কারণ নেই। কিন্তু সে অক্ষম হয়ে পড়ায় সাহায্যের জন্য ডাক দিল। পলায়নরত বানরটির কাছে তার সঙ্কেত হল ডাক শুনে কাছে আসার পক্ষে যথেষ্ট।

ভালোমতো খেলাধুলা হয়ে যাওয়ার পর বানর দুটির একটি খাঁচার এ কোনায়, অন্যটি ও কোনায় সরে গেল। কিন্তু শিগগিরই ওদের একজনের আবার খেলার ইচ্ছে হল। সে তার বন্ধুকে যেন আবার ছুটোছুটির প্রস্তাব দিল। বানুরে ভাষায় এই প্রস্তাবটি শোনায় অনেকটা 'হো-হো' কিংবা স্পষ্ট 'হ-হ-হ' আওয়াজের মতো (বিজ্ঞানীরা এ ধরনের আওয়াজের নাম দিয়েছেন সংযোগ-সঙ্কেত)। মানুষের ভাষায় এর অর্থ: 'আমি খেলতে চাই'। বন্ধুদের উদ্দেশে সঙ্কেত সচেতনভাবে পাঠানো হয় না। বানরেরা তা উচ্চারণ করে সাধারণভাবে, এর দ্বারা প্রকাশ করে তাদের মেজাজ।

কিন্তু বন্ধু তা শুনতে পায়। শুনে কাছে আসে।

ধর বানরের খাঁচায় এসে পড়ল এক অজানা বস্তু — রবারের খেলনা। বানর কখনও এমন বস্তু দেখে নি, তাই সে সতর্কতার সঙ্গে এগিয়ে যাচ্ছে অজানা বস্তুটার দিকে। এই সময় সে থেকে থেকে উচ্চারণ করে 'হুম্-হুম্'। এগিয়ে এসেই হঠাৎ লাফিয়ে একপাশে সরে যায়, এদিক-ওদিক তাকায়। একটা কুটো দেখতে পেয়ে সেটা তুলে নেয়, তারপর আবার সন্তর্পণে অজানা বস্তুটার দিকে এগিয়ে যায় কুটো দিয়ে সেটাকে স্পর্শ করে। কুটোটা ভালো করে শুঁকে দেখে, একমাত্র তারপরই, এবারেও অতি সন্তর্পণে, খেলনাটা আঙ্গুল দিয়ে ছোঁয়।

ভয়ঙ্কর কিছুই যে ঘটে নি এ ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়ার পর বানর খেলনাটি নিরীক্ষণ করতে থাকে। তার একাগ্র দৃষ্টি, নিবিষ্ট চলন আর মুখের অভিব্যক্তি — সব থেকেই প্রকাশ পাচ্ছে যে বানর বড় গুরুত্বপূর্ণ কাজে ব্যস্ত। এই সময় সে সর্বক্ষণ 'হুম্-হুম্' উচ্চারণ করে। যেন জিজ্ঞেস করছে: 'এটা কী হতে পারে?' এ ধরনের আওয়াজের নাম অনুমিতিসূচক। বস্তুত এই মুহূর্তে মনে হয় যে বানর কেবল গবেষণাকর্মেই ব্যস্ত, যেন দুনিয়ায় আর কোন কিছুতে তার কোন আগ্রহ নেই। কিন্তু ঐ মনেই হয়: দরজার ওপাশে অচেনা আওয়াজ
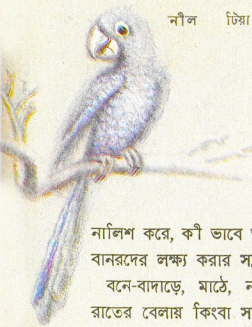
নীল টিয়া

শোনা গেল কি গেল না অমনি সে উৎকর্ণ হয়ে উঠল। এবারে 'হুম্-হুম্' ঐ আওয়াজকে উদ্দেশ্য করে: 'এর মানে কী হতে পারে?' অথবা 'এটা কী?'

বানরেরা খাবার সম্পর্কে আর বিপদ সম্পর্কে কথাবার্তা বলে, ভয় দেখায়, সাহায্যের জন্য ডাকে। বর্তমানে বিজ্ঞানীরা শিম্পাঞ্জির ভাষায় গোটা চল্লিশেক শব্দ জানেন। চিড়িয়াখানায় বানরদের লক্ষ্য করে দেখ। দেখতে পাবে পালের গোদা কী ভাবে তার পালকে হুকুম দেয়, কী ভাবে নিজেদের মধ্যে ঝগড়াঝাঁটি বাধার পর বানরেরা তার কাছে নালিশ করে, কী ভাবে তারা বাচ্চাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলে। আর, যদি বানরদের লক্ষ্য করার সুযোগ না-ই হয়, তাতে দুঃখ করার নেই।

বনে-বাদাড়ে, মাঠে, নদীর বুকে, পার্কে, দুপুরে কিংবা সকালে, রাতের বেলায় কিংবা সন্ধ্যায় — যখন যেখানেই থাক না কেন, শুনতে পার জীব-জন্তুদের কথাবার্তা। শুনতে পাবে পাখিদের কলতান আর বেঙের গ্যাঙর-গ্যাঙর ডাক, গঙ্গা-ফড়িংদের ঝিঁঝিঁ ডাক আর ইঁদুরের কিঁচ্কিঁচ্ আওয়াজ। পশু-পাখিদের কথাবার্তা শুনতে পার বাড়িতে আর বাড়ির উঠোনে — শুনতে পার মুরগীর কোঁকর-কোঁ, বিড়ালের মিউমিউ, কুকুরের ঘেউঘেউ। তোমরা অবশ্যই এসব হাজার বার শুনে থাকবে। অবশ্যই এই আওয়াজগুলির দিকে মনোযোগ দাও নি। আচ্ছা, এবারে চেষ্টা করে ধৈর্য ধরে পশু-পাখিদের লক্ষ্য কর। কেবল মনে রাখবে: ওদের জাতটা বড় 'কাজের' — অনর্থক কথা ওরা বলে না। ওদের প্রতিটি আওয়াজ কিছু একটার জন্য, কোন একটা কারণে অথবা কিছু একটা থেকে।

তৃতীয় অধ্যায়

ব্যালে-নৃত্য-নিছক শিল্পকলা নয়

‘আমি নাচি — আমি খাবার খংজে পেয়েছি!’

আমরা এখন জানি যে বহু পশু-পাখি যেমন আওয়াজের সাহায্যে, তেমনি ঘ্রাণের সাহায্যে নিজেদের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদান করে থাকে। কারও কারও পক্ষে এটা রীতিমতো যথেষ্ট, কারও কারও পক্ষে দুটি ভাষাও যথেষ্ট নয়।

বিজ্ঞানীরা লক্ষ্য করে দেখেছেন যে মৌমাছিরা সব সময় তাদের জন্য পেতে রাখা টোপ খংজে পায় না। কিন্তু ধর ওদের কেউ একজন যদি বিশেষ থালার ওপর রাখা চিনির সিরা দেখতে পায়, তাহলে দেখতে দেখতে থালার পাশে অন্য মৌমাছিরাও এসে জোটে। বিজ্ঞানীরা ভালোমতো দেখার পর লক্ষ্য করেছেন যে মৌমাছিদের একটা অংশ গুপ্ত-সন্ধানীর অনুসরণ করে উড়ে আসে না, তারা আসে খানিকটা পরে — যেন নিজে নিজেই খাবারের সন্ধান পেয়ে। তাহলে কেন তারা গুপ্ত-সন্ধানী মৌমাছির এখানে আগমনের আগে নিজে নিজে উড়ে এলো না? স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে যে গুপ্ত-সন্ধানী মৌমাছি কোনভাবে তাদের জানিয়ে থাকবে যে খাবার আছে আর সে খাবার কেমন (ধরলাম এটা না হয় মৌমাছিরা জানতে পারল গন্ধ থেকে), শুধু তা-ই নয়, সে খাবার কোথায় আছে তা-ও বলে থাকবে। তোমাদের এখন অজানা নেই যে কোন কোন সংবাদ সে জানায় ডানার চটচট আওয়াজ করে। কিন্তু ডানার সাহায্যে ত আর সব কিছু জানানো যায় না।

ঠিক হল যাচাই করে দেখতে হবে। মৌমাছিদের রাখা হল কাচের দেয়াল দেওয়া বিশেষ মৌচাকে। মৌচাকের ভেতরে কী হচ্ছে কাচের দেয়াল দিয়ে তা দিব্যি দেখা যায়। শুরু হল পর্যবেক্ষণ। একটা মৌমাছি উড়ে এলো। মৌমাছিটা এই মাত্র চিনির সিরার থালার কাছে ছিল। এখন মৌচাকে ফিরে, গলার থলিতে বয়ে আনা শিকার দিয়ে দেওয়ার পর সে শুরু করে... নাচ। সত্যি কথা বলতে গেলে কি, পাক

খায়। এই ঘূরপাকের পরিধি অল্প — কোষে কোষে আর মৌমাছিতে ঠাসা মৌচাকের ভেতরে, পাশ ফেরারও জো নেই — তবু বন্ধুরা ঠেসাঠেসি হয়ে থেকে চাতাল খালি করে দেয়। উড়ে-আসা মৌমাছিটা

তার ওপর ঘূরপাক খায়। মৌমাছিরা ঐ একই বৃত্তে পাক খেয়ে নাচিয়েটির পেছন পেছন ছুটতে থাকে। তারা নাচিয়েকে প্রায় শুঁড় দিয়ে ছুঁয়ে দেখে। তারপর একের পর এক চাক থেকে উড়ে বেরোতে থাকে। কয়েক মিনিট বাদেই তারা এসে বসে মিষ্টি সিরার থালায়।

মৌচাকে ফিরে এসে এই মৌমাছিরাও নাচল, আবার রওনা দিল সিরার উদ্দেশ্যে। কিন্তু ইতিমধ্যে তাদের নাচের সময় নতুন এক দল মৌমাছি চাক থেকে উড়ে বেরিয়ে এসে থালার দিকে রওনা দিল। এই ভাবে মৌচাকে সবটা সিরা বয়ে না আনা পর্যন্ত মৌমাছিরা থালার দিকে উড়ে উড়ে আসতে থাকে। কিন্তু একটা অদ্ভুত ব্যাপার এই যে থালায় যতক্ষণ সিরা ছিল ততক্ষণ সব মৌমাছিরই আচরণ ছিল এক রকম — ওরা ফিরে আসছিল, নাচছিল আবার যাচ্ছিল নতুন খাবার আনতে। কিন্তু থালার সিরা প্রায় শেষ হয়ে যেতে মৌমাছিদের আচরণে পরিবর্তন ঘটল: মৌচাকে ফেরার সময় এখন আর তারা নাচে না।

বলাই বাহুল্য, একটা পরীক্ষা থেকে কোন সিদ্ধান্তে আসা উচিত নয়। কিন্তু শত শত, হাজার হাজার পরীক্ষা চালানো হয় এবং অবশেষে স্পষ্ট বোঝা গেল মৌমাছিদের চক্রাকার নৃত্য হল কোথাও যে খাবার আছে সেই সংবাদ জ্ঞাপন। পরন্তু, নিছক খাবার নয়, প্রচুর খাবার। এই কারণেই সিরা ফুরিয়ে আসতে আসতে নাচ বন্ধ হয়ে যায়।

কিন্তু খাদ্যের সন্ধান যে মিলেছে এটা জানানোই যথেষ্ট নয়: খাবার কোথায় আছে তা-ও বলা দরকার। মৌমাছিরাও এ নিয়ে পরস্পরের মধ্যে কথাবার্তা বলে। কিন্তু কী ভাবে?

মৌমাছিদের গোপন রহস্য জানার বড় ইচ্ছে হল মানুষের — মানুষ তাই চিনি আর সিরার ব্যাপারে কোন কার্পণ্য করল না, নিজের সময় আর শক্তিরও মায়া করল না। শেষকালে বুঝতে পারল, চক্রাকার নৃত্যের অর্থ হল খাবার কাছেই আছে, আছে মৌচাকের ধারেকাছে!

মনে হতে পারে এখানেই ছেদ টানা যায়। কিন্তু বিজ্ঞানীরা হলেন অশান্ত প্রকৃতির মানুষ। কেন কোন কোন মৌমাছি খাবার নিয়ে চাকে ফিরে এসে স্বাভাবিক বৃত্ত রচনা করে নাচে, কারও কারও আচরণ হয় কেমন যেন অদ্ভুত — কখনও সোজা পথে ছোটে, কখনও পাশে মোড় নেয়, কখনও আবার সোজা ছোটে, ফের রচনা করে অর্ধবৃত্ত, কিন্তু এবারে একেবারে অন্য দিকে? কেন এ সময় তারা সর্বক্ষণ পেট নাড়ে? কেনই বা মৌচাকের মৌমাছিরা নাচে নেমে এই সমস্ত গতিবিধির সবগুলির পুনরাবৃত্তি করে তারপর মৌচাক ছেড়ে ওড়ে? — এসব প্রশ্নও বিজ্ঞানীদের বড় কৌতূহলী করে তুলল।

এবারেও কাজে এলো পরীক্ষা-নিরীক্ষা। যখন একটা খাদ্যপাত্র রাখা হল মৌচাকের কাছাকাছি, অন্যটা আরও খানিকটা দূরে তখন

পরিষ্কার দেখা গেল: যারা কাছের খাদ্যপাত্র থেকে উড়ে আসছে তারা নাচছে চক্রাকার নৃত্য, যারা একটু দূরেরটা থেকে, তারা নাচছে আরেক ধরনে, যাকে বিজ্ঞানীরা নাম দিয়েছেন দোলননৃত্য। কাছের খাদ্যপাত্রটা একটু দূরে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হতে মৌচাকে প্রত্যাবর্তনকারী সমস্ত মৌমাছি দোলননৃত্য নাচতে শুরু করে দিল। এর অর্থ, মৌমাছিরা পরস্পরকে কেবল খাদ্যের সংবাদই জানাল না, সেই খাবার কাছে না দূরে কোথায় আছে তা-ও জানাল। কাছের খাবার সম্পর্কে সংবাদ জানানোর আরও একটি অর্থ আছে: মৌচাকের চারপাশে উড়লেই সন্ধান মিলছে। আচ্ছা, খাবার যদি দূরে থাকে, কোথায় তার খোঁজ করতে হবে? এমনও ত হতে পারে যে মৌমাছি তার বান্ধবীদের অনেকটা সঠিক ঠিকানা জানায়? খাদ্যপাত্রগুলি মৌচাক থেকে ১০০, ২০০, ৫০০, ১০০০ মিটার — মোটের উপর ৬০০০ মিটার পর্যন্ত দূরত্বে

ম্যাক্রোপোডাস মাছ

সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হল। প্রতি বারই ঐ পাত্রগুলি থেকে মৌচাকে ফিরে মৌমাছিরা দোলননৃত্য নাচে। কিন্তু প্রত্যেক বার সে নাচে ছিল নূতনত্ব! অর্থাৎ নাচ এক হলেও ১০০ মিটার দূরে অবস্থিত খাদ্যপাত্র থেকে ফিরে এসে মৌমাছি যেখানে এপাশে-ওপাশে হেলেদুলে ১৫ সেকেণ্ডে নয়-দশটা পূর্ণ বৃত্ত টানে, সেখানে ২০০ মিটার দূরে অবস্থিত পাত্র থেকে ফিরে এসে ঐ ১৫ সেকেণ্ড সময়ের মধ্যেই সে মাত্র সাত বার পাক খায়, আর এক কিলোমিটার দূরবর্তী খাদ্যপাত্র থেকে উড়ে এসে ঘোরে সাড়ে চার পাক। দুটি বৃত্তের অর্থ — ছয় কিলোমিটার দূরত্ব।

কিন্তু এটাও সব নয়। সঠিক দূরত্ব-নির্দেশও মৌমাছিদের খাদ্য খুঁজে পেতে সাহায্য করবে না, যদি কোন দিকে তল্লাশি চালাতে হবে তা জানা না যায়। দেখা গেছে, কোন দিকে উড়ে যেতে হবে সে-খবরও মৌমাছিরা একে অন্যকে জানায়। দোলননৃত্যের সময় মৌমাছি কখনও কখনও সোজা পথে ছোটে। এই ছোটাই মোটামুটি দিক নির্দেশ করে।

মৌমাছির ভাষা সম্পর্কে প্রথম তথ্য লোকে পায় অপেক্ষাকৃত হাল আমলে — বছর পঁয়তাল্লিশ আগে। তারপর থেকে হাজার হাজার পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলে। কিন্তু এ কেবল শুরু। মৌমাছিরা মানুষকে আরও বিস্মিত করবে, যদিও এখন অবধি যা জানা গেছে তা-ই অলৌকিক ঘটনার মতো।

'এই, সাথীরা! শিকার মিলেছে! জলদি চল!' পিঁপড়ের বাসায় পিঁপড়েদের কোন জ্ঞাতি ভাই উপস্থিত হয়ে যখন হঠাৎ ঘুরতে থাকে কিংবা আঁকাবাঁকা রেখা আঁকতে শুরু করে, তখন পিঁপড়েরা তার আগমনকে হয়ত এভাবে, হয়ত বা আর কোনভাবে বুঝে থাকে। কিন্তু সে যাই হোক না কেন, সাথীরা সঙ্গে সঙ্গে জোট বেঁধে 'নাচিয়ে'টার পিছু পিছু রওনা দেয়। এখন তারা ঠিক জেনে গেছে যে গুপ্ত-সন্ধানী পিঁপড়েটি শিকারের খোঁজ পেয়েছে, কিন্তু সে শিকার বয়ে নিয়ে যাওয়া তার একার সাধ্য নয়। পিঁপড়েরা সার বেঁধে গুপ্ত-সন্ধানীটির পেছন পেছন ছোটে। কিন্তু ওরা সিধে পথে ছুটছে না কেন? ব্যাপারটা খুবই সোজা: পিঁপড়ের বাসার দিকে তাড়াতাড়ি যাওয়ার পথে গুপ্ত-সন্ধানীটি যে গন্ধযুক্ত চিহ্ন রেখে গেছে ওরা তা অনুসরণ করে চলছে। আর সে চিহ্ন আঁকাবাঁকা। অদ্ভুত: কারও যখন তাড়া থাকে তখন সে সব সময়

পথ সংক্ষেপের চেষ্টা করে। সকলেই জানে যে সংক্ষিপ্ততম পথ হল সিধে পথ। পিঁপড়েটার স্পষ্টতই তাড়া ছিল। তাহলে কেন সে এপাশে-ওপাশে হেলেদুলে আঁকাবাঁকা পথে চলল? কী আর করা যাবে? — ওর হালই এই রকম: তড়িঘড়ি পিঁপড়ের বাসায় যাওয়া দরকার, অথচ পাগুলো আপনা-আপনিই চলতে থাকে নাচের ভঙ্গিতে। ঠিক এই কারণেই রেখা হয় আঁকাবাঁকা।

মৌমাছি আর পিঁপড়েদের পর্যবেক্ষণ করা সহজ নয়। তবে জীব-জন্তুরা খাবারের সন্ধান পেলে কেমন নাচে তা তোমরা দেখতে পার।

তোমার কিংবা তোমার কোন বন্ধুর যদি অ্যাকোয়ারিয়াম থাকে আর তাতে যদি ম্যাক্রোপোডাস জাতের মাছ থাকে তাহলে লক্ষ্য করে দেখো। অ্যাকোয়ারিয়ামে খাবার ফেলা হল। মাছ দ্রুত বেগে খাবারের দিকে ছুটে গেল, কিন্তু হঠাৎ পাখনা চেপে আড়ষ্ট হয়ে থামল, একবার দুবার শরীরটা বাঁকাল, তারপর আবার ছুটল খাবারের দিকে। মাছ যে এ ধরনের অঙ্গসঞ্চালন করে তার কারণ এই নয় যে তার পেট ভরা আছে। এমনকি খিদেয় যদি সে মর-মরও হয় তাহলেও প্রথমে সে নেচে নেবে, একমাত্র তারপরই সে ছুটবে খাবারের দিকে। খাওয়া শুরু করার আগে মাছ তার জ্ঞাতি-গোত্রীয়দের জানিয়ে দেবে, 'আমি নাচি — আমি খাবার খুঁজে পেয়েছি' — এটাই নিয়মে দাঁড়িয়ে গেছে।

'আমি নাচি — আমি তোমাকে ভালোবাসি!'

মাদীটা ছিল ফুরফুরে আর ছিমছাম চেহারার। পুরুষটার তা নজরে পড়ল।

পুরুষটা ছিল শক্তিশালী, পুরুষালী চেহারার। মাদীটারও তা নজর এড়ালো না।

'ও বেশ সুশ্রী,' পুরুষটা ভাবল, 'যদিও বিলকুল সাদা।' আর মাদীটা ভাবল, 'ও দারুণ সুন্দর, হলই না হয় বিলকুল কালো।' ওদের মধ্যে ভাব হয়ে গেল, হয়ত ওরা একে অন্যকে ভালোও বেসে ফেলল। সারা সময় ওরা একসঙ্গে কাটাত, শেষে ঠিক করল নিজেদের বাসা বাঁধবে আর বাচ্চাকাচ্চা নিয়ে সেখানে একসঙ্গে বাস করবে। কিন্তু এখানেই ঘটে গেল ট্র্যাজিডি। বাসা বানানো যখন শেষ হয়ে গেল তখন পুরুষটি তার

সঙ্গিনীকে বাসায় আমন্ত্রণ জানাল। কিন্তু সঙ্গিনী এলো না। 'ও আসছে না কেন?' সে ভাবল। 'নাকি ও আমাকে আর ভালোবাসে না?'

মাদীটা তার সঙ্গীর দিকে তাকায় আর ভাবে, 'আচ্ছা, ও আমাকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছে না কেন? ভালোবাসায় ভাঁটা পড়ল নাকি?'

না, ওর ভালোবাসায় ভাঁটা পড়ে নি। ও ত তাকে ডেকেই ছিল, কিন্তু সে গেল না। শেষ অবধি তাদের ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল। সবটাই ঘটল এই কারণে যে তারা একে অন্যকে বুঝতে পারল না — তারা কথা বলছিল বিভিন্ন ভাষায়।

আসলে তারা এই ভাবে ভাবে নি, কথাবার্তাও বলে নি। তার কারণ, তারা ছিল সারস — মন্দাটা কালো আর মাদীটা সাদা। কিন্তু তারা না ভাবলেও, কথাবার্তা না বললেও গোটা ব্যাপারটা কিন্তু এই রকমই ঘটল।

গোড়ায় সবই দিব্যি চলছিল! অবশেষে কালো সারস তার সঙ্গিনীটিকে বাসায় আমন্ত্রণ জানাল। আমন্ত্রণ জানাল কালো সারসদের মধ্যে যা যা নিয়মের চল আছে, সেই অনুযায়ী: সে অনেকক্ষণ, জেদ ধরে মাথা নাড়িয়ে চলল, এমনকি সচরাচর যেমন নাড়ানো হয় তার চেয়েও বেশিক্ষণ — যেহেতু সঙ্গিনী তাকে বুঝতে পারছিল না। এদিকে সঙ্গিনীটির প্রত্যাশা ছিল অন্য রকম আমন্ত্রণের: সাদা সারসদের সমাজে মন্দারা ঠোঁট ঠকঠক করে মাদীদের বাসায় আমন্ত্রণ জানায়। কালো সারস সাদা সারসকে বুঝতে পারল না, আর সাদাও কালোকে বুঝতে পারল না। তাই তাদের ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল। বলাই বাহুল্য, ওরা ভালোবাসার কথা ভাবে নি — ভালোবাসার কথা ভাববার ক্ষমতা পাখিদের নেই, এই অনুভূতিকে আমরা যে ভাবে বুঝি সেই অর্থে তা তাদের জানা আছে কি না সন্দেহ। ওদের হাজার হাজার বছর আগে সমস্ত সারস যেমন আচরণ করত ওরা নেহাৎ তেমনি করে। মন্দাটা করে আর দশটা কালো সারসের মতো, তার সঙ্গিনীটি করে সাদা সারসদের মতো। ওদের আচরণ হয় বিভিন্ন ধরনের, ওরা কথা বলে ভিন্ন ভিন্ন ভাষায়।

বসন্তকালে তোমরা হয়ত সাদা রঙের বাঁধাকপি-প্রজাপতি দেখে থাকবে। ওরা একা একা ওড়ে, আবার অনেক সময় দুটি-তিনটি মিলে একসঙ্গেও ওড়ে। তখন ওরা যেন একে অন্যের পাশে ঘুরে ঘুরে উড়তে থাকে। কখনও একটি কখনও বা অন্যটি উড়তে উড়তে খানিকটা উঁচুতে উঠে যায়। তারা নিছক খেলা করে না — তারা কথাবার্তা বলে। লক্ষ্য করে দেখ: প্রজাপতি সচরাচর ঘন ঘন উদ্ভিদের ওপর বসে। অথচ এরা উড়ল ত উড়লই, একবারও বসল না। অবশ্য শেষ অবধি কোথাও না কোথাও তারা বসবেই। তবে তারা শূন্যমার্গেই তাদের কথাবার্তা চালানো বেশি পছন্দ করে।

আবার জুলাইয়ের শেষে ওড়ে এমন এক জাতের প্রজাপতি আছে যারা মাটিতেই 'প্রেম নিবেদনের' বেশি পক্ষপাতী।

পুরুষ-প্রজাপতি স্ত্রী-প্রজাপতির আগমন প্রতীক্ষা করে। প্রতীক্ষা করতে পারে অনেকক্ষণ, ধৈর্য ধরে। যখন তার আগমন ঘটে তখন পুরুষ-প্রজাপতি তার দিকে ধেয়ে যায়। পুরুষ-প্রজাপতিকে দেখতে পাওয়া মাত্র স্ত্রী-প্রজাপতি মাটিতে নেমে পড়ে। সে এসে পাশে বসে এবং সোহাগ জানাতে থাকে। দেখতে দেখতে পুরুষ-প্রজাপতিটা তার সামনে ভঙ্গি নিয়ে দাঁড়ায়, পাখনা কাঁপায়, শুঁড় নাড়ায়। তারপর পাখনা উঁচু করে পাখনার সুন্দর উলটো দিকটা তাকে দেখায়। আবার পাখনা কাঁপায়, শুঁড় নাড়ে। পরে হঠাৎ নিজের জমকাল পাখনা সম্পূর্ণ ছড়িয়ে দিয়ে নীচু হয়ে ঝুঁকে পড়ে। সে যেন বলে, 'আমি তোমার শ্রীচরণে

কাক

আশ্রয় নিলাম।' স্ত্রী-প্রজাপতি নিজের শুঁড় তার দিকে বাড়িয়ে দেয়। সে 'নতজানু অবস্থা থেকে' না উঠেই নিজের দুই ডানার মাঝখানে স্ত্রী-প্রজাপতির শুঁড় ধরে চাপ দেয়, এই সময় সে তার ডানাদুটো ওঠায় আর গুটায়। প্রেম নিবেদন পর্ব সংঘটিত হল। এবারে যেন আনন্দে মত্ত হয়ে 'প্রেমিক' নাচ শুরু করে: দ্রুত পা চালিয়ে সে 'প্রেমিকার' চারধারে হাঁটতে থাকে।

কখনও কখনও এই শ্রেণীর পুরুষ-প্রজাপতির ভুল হয়ে থাকে: কখনও হয়ত একটা পাতা উড়তে দেখে তাকেই হঠাৎ প্রজাপতি বলে মনে করে বসল, কখনও হয়ত ধাওয়া করল অন্য জাতের প্রজাপতির পিছন। অবশ্য সারসদের মতো ট্র্যাজিডি এখানে ঘটবে না: ভিন্ন জাতের প্রজাপতিটি তার সোহাগে কোন আমল না দিয়ে কেবল উড়ে চলে যাবে। প্রজাপতির কাছে এটা মারাত্মক কোন ভুল নয়, কিন্তু বিজ্ঞানীদের কাছে এ ভুল হয়ে দাঁড়াল দস্তুরমতো প্রহেলিকা। প্রজাপতি অতি ক্ষুদ্র কীট-পতঙ্গের পেছন পেছন পর্যন্ত, এমনকি পাতার পেছন পেছন ধাওয়া করে, কখনও কখনও দোয়েল-শ্যামাদের সমান আকারের পাখির পেছন পেছনও ধাওয়া করে। এর কারণ কী? তার বিস্ময়কর অনুভূতি কি তাকে কিছুই ধরিয়ে দেয় না? দেখা যাচ্ছে এক্ষেত্রে প্রজাপতি তার অনুভূতিকে কাজে লাগায় না।

চড়াই
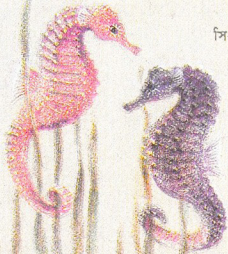
আচ্ছা, তাহলে চোখ? পুরুষ-প্রজাপতি কি দেখতে পায় না যে তার সামনে কোন স্ত্রী-প্রজাপতি নেই, আছে সাধারণ পাতা কিংবা পাখি?

এর ব্যাখ্যা পাওয়ার উদ্দেশ্যে বিজ্ঞানীরা প্রায় পঞ্চাশ হাজার পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালান। স্ত্রী-প্রজাপতিদের প্রতিরূপ, অন্যান্য কীট-পতঙ্গ আর নানা রকমের প্রতিমূর্তি দেখিয়ে পুরুষ-প্রজাপতিদের ঠকানো হল। সত্যিকারের প্রজাপতিদের মতো রং-করা প্রতিমূর্তি ও প্রতিরূপ ছিল; প্রজাপতির চেয়ে আকারে অনেক বড় বা অনেক ছোট প্রতিরূপও ছিল। কিন্তু না টোপের রঙ, না তার আয়তন — কোনটাতেই পুরুষ-প্রজাপতিরা

সি-হর্স

বিমূঢ় হল না। বরং উলটো — ওরা আরও উৎসাহের সঙ্গে অপেক্ষাকৃত বড় কিংবা অপেক্ষাকৃত গাঢ় রঙের টোপের পিছু ধাওয়া করল — সম্ভবত, গাঢ় রঙের ও বড় টোপগুলিকে তারা ভালোমতো দেখতে পাচ্ছিল। সত্যিকারের প্রজাপতিদের পেছনে যেমন, ঠিক সেই একই রকম উৎসাহের সঙ্গে পুরুষ-প্রজাপতি গোল, চৌকোনা আর তিনকোনা জিনিসগুলির পিছু ধাওয়া করতে গেল। অথচ অনেক সময় আসল প্রজাপতিদের দিকে ফিরেও তাকাচ্ছিল না। ব্যাপারটা কী? দেখা যাচ্ছে তার কাছে গুরুত্বপূর্ণ মাত্র একটি বস্তু: গতি — নাচ।

প্রজাপতিরা অবশ্য হাল্কা, ফুর্তিবাজ জাতের জীব। নাচটা যেন তাদের মানায়ও। কিন্তু বেজার স্বভাবের মাকড়সাদের কাছ থেকে এ ধরনের ব্যাপার আশা করাই কঠিন, তাই না? অথচ দেখা যাচ্ছে যে ওরাও উদ্দাম নৃত্য করে, ওস্তাদ নাচিয়ে। আটটা পায়ে আর নাচা যাবে না কেন! হাঁটুও ভাঙা যায়, লাফানো যায়। মাকড়সারাও তাই চেষ্টা করে। বিভিন্ন মাকড়সা বিভিন্ন রকমে নাচে, তবে সবারই নাচ উদ্দাম!

সি-হর্স নামে এক জাতের মাছ আছে — কিছুটা দাবার ঘোড়ার মতো দেখতে বলে তাদের এই নাম — তারাও কথা বলে নাচের ভাষায়। সি-হর্স হয়ত দেখতে পেল স্ত্রী-জাতের একটি সি-হর্স মাছ; সে কেমন যেন লাজুক-লাজুক, মুখচোরা ভাব নিয়ে তার দিকে এগিয়ে গেল, দূর থেকেই বিনীতভাবে মাথা নোয়াতে লাগল। এমনও দেখা যায় যে অহংকারী সুন্দরীটি হয়ত পাশ কাটিয়েই চলে গেল। কিন্তু স্তাবকটিকে যদি তার পছন্দ হয়ে যায়, তাহলে নির্দিষ্ট সংকেতের সাহায্যে সে তাকে তা জানিয়ে দেয়। তখনই শুরু হয় নৃত্য। সঠিক বলতে গেলে দ্বৈত নৃত্য। প্রথমে কোয়াড্রিল।

উচ্চিংড়া

মাকড়সা

শঙ্খচিল জাতের পাখি
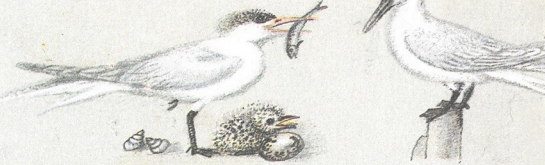
সি-হর্সরা ধীরে ধীরে পরস্পরের কাছাকাছি আসে, মাথা নোয়ায়, আবার আলাদা হয়ে ঘুরে যায়, আবার একসঙ্গে হয় এবং আবারও মাথা নুইয়ে আলাদা হয়ে সরে যায়। এই রকম চলতে থাকে বেশ দীর্ঘ সময় ধরে, কখনও কখনও কয়েক দিন।

কোয়াড্রিলের পর চলে ওয়াল্‌জ। মাছেরা অশ্রুত সঙ্গীতের তালে তালে ঘুরতে থাকে খাঁটি নাচিয়েদের মতো।

তবে সবচেয়ে উৎসাহী নাচিয়ে, প্রণয়লীলায় সবার চেয়ে ওস্তাদ হল সম্ভবত পাখিরা।

ফেব্রুয়ারী মাসেই, বাইরে যখন হিম রয়ে গেছে, অথচ আকাশ নির্মেঘ ও রৌদ্রোজ্জ্বল, তখন হয়ত কাকদের খেলা লক্ষ্য করে থাকবে। কখনও একটি পাখি, কখনও বা অন্য আরেকটি সাঁ সাঁ করে ওপরে উঠে যায়, তারপর উঁচু থেকে টুপ করে নীচে এসে পড়ে। কখনও ওরা একসঙ্গে ওপরে ওঠে এবং একসঙ্গে দ্রুত বেগে নীচে নামে। এ হল কাকদের বসন্তকালীন খেলা। অদূরেই বসন্ত, যদিও এখনও ঠাণ্ডা। চড়াইপাখিরাও প্রণয়লীলায় ওস্তাদ। বসন্তকালে চড়াইপাখির ঝাঁককে লক্ষ্য করলে নির্ঘাত দেখতে পাবে কী ভাবে ডানা আর লেজ হাত-পাখার মতো ছড়িয়ে দিয়ে পুরুষ-চড়াই অহংকারী স্ত্রী-চড়াইয়ের

সামনে নাচে। পাখিরা মাটিতে নাচে, আকাশেও নাচে। এক দলকে দেখে মনে হয় যেন আনাড়ী নাচিয়ে, আরেক দল যেন খাঁটি ব্যালে-শিল্পী। তারা ঘুরপাক খেয়ে আর দৌড়াতে দৌড়াতে কখনও পা উঁচুতে উঠিয়ে দেয়, কখনও নীচু হয়ে তাদের রমণিসমাজকে অভিবাদন জানায়, কখনও হঠাৎ দ্রুতবেগে ঘুরপাক খেতে থাকে, কখনও বা এক জায়গায় আড়ষ্ট হয়ে থেমে যায়। কখনও কখনও পাখির জুটি বেঁধে নাচে, কখনও নাচে বড় বড় দল বেঁধে। এসব নাচই 'প্রেম নিবেদন', 'পাণি ও হৃদয় প্রার্থনা'।

উত্তরের সামুদ্রিক পাখি

অ্যাডেলি পেঙ্গুইন
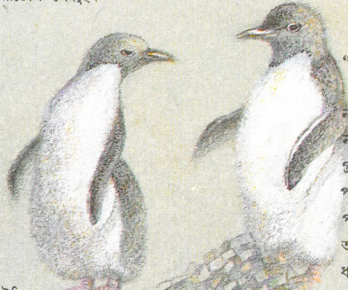
'আমি তোমাকে ভালোবাসি, আমি তোমাকে উপহার দিচ্ছি...'

আমেরিকান চেরি বার্ড

নাচ — প্রেম নিবেদনের চমৎকার উপায়। কিন্তু এটাই একমাত্র উপায় নয়। বহু পশু-পাখি উপহারের সাহায্যে প্রেম নিবেদন করে। যেমন গ্রীষ্মপ্রধান দেশের বনে-জঙ্গলে এক জাতের জংলা পোকা থাকে যাদের পুরুষবর্গ অশ্বত্থ-বট জাতীয় গাছের বীজ সঙ্গে করে আনে। স্ত্রী-পতঙ্গের সঙ্গে দেখা হলে তাকে সেই বীজ উপহার দেয় — ভাবটা এই, আপ্যায়িত হোন। প্রসঙ্গত, এই পোকারা উদ্ভিজ্জ খাদ্য খেয়ে জীবন ধারণ করে।

উচ্চিংড়া নামে এক জাতের পতঙ্গ আছে — তাদের চেনা যায় খাড়া লম্বা শুঁড় আর গোলাকার মাথা দেখে — উপহার ছাড়া স্ত্রী-উচ্চিংড়াদের ধারেকাছে ঘেঁষার অধিকার এদের নেই: সে উপহার একরত্তি মাছি হতে পারে কিংবা ছোট্ট একটা মশাও হতে পারে। কখনও কখনও স্ত্রী-পতঙ্গরা আহারের বদলে চেয়ে বসে ফুল। ওদের এই আবদারও পুরুষ-পতঙ্গদের পূরণ করতে হয়। অবশ্য গোটা একটা তোড়া কিংবা একটা ফুলও উপহার দেওয়ার সাধ্য তাদের নেই — তাদের সাধ্যসীমা একটি পাপড়ি (আসলে ব্যাপারটা ত আর সংখ্যা নিয়ে নয় — বড় কথা হল মনোযোগ!)।

আবার এমন আবদারেও আছে যারা উপহারেই সন্তুষ্ট নয় — সেই উপহার যাতে ভালোমতো মোড়া হয় এটাও তাদের দরকার। তাই পুরুষ-পতঙ্গরা নিজেরাই রেশমী গুটি বুনে তার মধ্যে উপহার প্যাক করে আনতে বাধ্য হয়। অবশ্য এমন কেউ কেউ আছে যারা চালাকি করে

পানকৌড়ি

উপহার ছাড়া খালি গম্বুজটি স্ত্রী-পতঙ্গদের কাছে চালিয়ে দেয় — কীট-পতঙ্গদের মধ্যেও জোচ্চর আছে! কিন্তু উচ্চিংড়া শ্রেণীর কোন কোন পতঙ্গ খালি গম্বুজটিও প্রসন্নচিত্তে গ্রহণ করে যদি তা সুন্দরভাবে তৈরি করা হয়ে থাকে।

কার্লিউ

স্ত্রী-মাকড়সারাও উপহার দাবি করে। তারা অত্যন্ত বাস্তববুদ্ধিসম্পন্ন: ফুল কিংবা গম্বুজটি-ফুলদানি তারা চায় না। তাদের দরকার মাছি। পুরুষ-মাকড়সা তাই মাকড়সার জালে প্যাক করা মাছি আগে আগে নিয়ে স্ত্রী-মাকড়সার দিকে এগিয়ে আসে।

উপঢৌকন — এটাই হল কথা, এই কথা দু'পক্ষেরই বোধগম্য; তার প্রমাণ হল এই যে স্ত্রী-মাকড়সা 'মোড়ক-করা' মাছিটাকে গ্রহণ করে এবং সঙ্গে সঙ্গে খেতে থাকে। অথচ অন্য পরিস্থিতিতে হয়ত সে মাছি-টাকে আমলই দিত না — সচরাচর কেবল সচল পোকামাকড়েই মাকড়সাদের আগ্রহ।

পশু-পাখিরা বহু ক্ষেত্রেই উপহারের ভাষার আশ্রয় নেয়।

শঙ্খচিলের মতো দেখতে এক জাতের পাখি আছে যারা সঙ্গিনী খুঁজে বার করার উদ্দেশ্যে মাছ ধরে আর এই উপহার সঙ্গে নিয়ে ভ্রমণে বেরিয়ে পড়ে। সে উপকূল ধরে হাঁটা দেয়, চলতে চলতে উপকূলে যে-সমস্ত পাখি বসে আছে তাদের খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে শেষে ওদের মধ্য থেকে একটিকে পছন্দ করার পর তার দিকে মাছটি বাড়িয়ে দেয়। এমনও দেখা যায় যে স্ত্রী-পাখিটি মাছ না নিয়ে অহংকার করে মুখ ঘুরিয়ে নিল। তখন সে মাছটা তুলে নিয়ে আরও এগিয়ে যায়। দু'বার-তিন বার প্রত্যাখ্যাত হলেও সে ঘাবড়ায় না। সে জানে — এক সময় না এক সময় কেউ না কেউ উপহার গ্রহণ করবে। তা-ই ঘটে: কেউ একজন শেষ অবধি মাছ গ্রহণ করে। তখন ওরা দুটিতে মাছটার দুপ্রান্ত ধরে কিছুক্ষণ পাশাপাশি বসে থাকবে।

এই মৎস্য-উপঢৌকন ওরা কিন্তু খায় না — এটা খাওয়ার জন্য নয়, কথাবার্তা চালানোর জন্য।
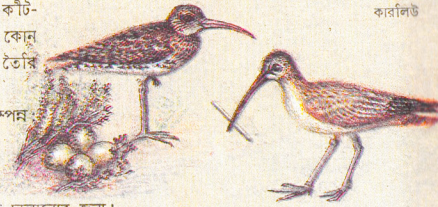
উপহারের সাহায্যে পরস্পরে কথা বলার জন্য যে অবশ্যই খাদ্যদ্রব্য উপহার দিতে হয় এমন নয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ, নুড়ি কিংবা কুটোও উপহার দেওয়া যেতে পারে, যেমন করে থাকে কোন কোন পাখি।

অ্যাডেলি পেঙ্গুইনরা তাদের স্ত্রী-জাতিকে উপঢৌকন দেয় একটি নুড়ি নয়, গোটা একটা স্তূপ। কখনও কখনও স্ত্রী-পেঙ্গুইন এই সম্পদ গ্রহণ করে না, তখন পুরুষ-পেঙ্গুইন অন্য পাত্রীর খোঁজ করে। তার পায়ের কাছে নিজের সম্পত্তি সাজিয়ে রেখে পেঙ্গুইন উত্তরের প্রতীক্ষা করে। উপহার যদি প্রসন্নচিত্তে গৃহীত হয়, তাহলে নুড়ির এই স্তূপ ভবিষ্যৎ নীড়ের ভিত্তি হিসেবে কাজ করে।

বাওয়ার বার্ড

উত্তরাঞ্চলের এক জাতীয় পাখি পরস্পরকে জলজ উদ্ভিদের ছোট ছোট টুকরো উপহার দেয়, আর আমেরিকান চোরি বার্ডরা দেয় ছোট ছোট বঁইচি। তবে বঁইচি পেয়ে স্ত্রী-পাখিটা তা গলাধঃকরণ করে পুরুষ-পাখিটিকে নিঃসঙ্গ অবস্থায় ফেলে রেখে উড়ে চলেও যেতে পারে। কিন্তু পুরুষ-পাখিটিকে তার যদি মনে ধরে, তাহলে সে অবশ্যই উপঢৌকন ফেরত দেবে। পুরুষ-পাখি আবার তাকে বঁইচি দেবে, স্ত্রী-পাখি আবার তা ফেরত দেবে। পর পর অনেক বার এই রকম চলে। 'কথাবার্তা' দীর্ঘসূত্রী হতে পারে — এক ঘণ্টা, এমনকি দু' ঘণ্টা ধরেও চলতে পারে।

কিন্তু পাখিরা অনেক কাল হল 'বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ' হলেও উপহারের সাহায্যে কথাবার্তা চলতে পারে। সে ক্ষেত্রে উপঢৌকনের তাৎপর্য হয় অন্য।

কোন কোন জাতের শঙ্খচিল ও পানকৌড়ি যখন বাসার ওপর উড়ে আসে তখন সর্বদাই একে অন্যের জন্য খানিকটা জলজ উদ্ভিদ কিংবা ঘাসপাতা নিয়ে আসে। এই উপঢৌকন ছাড়া যেখানে ডিম আছে সেই বাসায় স্ত্রী-পাখি যেমন পুরুষ-পাখিকে প্রবেশ করতে দেবে না, তেমনি পুরুষ-পাখিও স্ত্রী-পাখিকে প্রবেশ করতে দেবে না।

পুরুষ-কারলিউ পাখি বাসায় উড়ে এসে স্ত্রী-কারলিউকে কোন নুড়ি বা কুটো উপহার দেয়, এই সময় সে নত হয়ে অভিবাদন জানায়। স্ত্রী-পাখিকে উপহার নিতে হবে, যতক্ষণ না নিচ্ছে ততক্ষণ পুরুষ-পাখিটি অভিবাদন করা থেকে ক্ষান্ত হবে না।

এই 'কথাবার্তার' তাৎপর্য এখনও স্পষ্ট নয়, যদিও এর যে একটা অর্থ আছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু অস্ট্রেলিয়ায় বসবাসকারী বাওয়ার বার্ডরা তাদের স্ত্রী-জাতিকে যে সম্পদ অর্পণ করে তার তুলনায় কারলিউয়ের নুড়ি আর কুটো এমনকি অ্যাডেলি পেঙ্গুইনদের গোটা একেকটি নুড়ির স্তূপ নিতান্তই তুচ্ছ!

অরোক্স (লুপ্তপ্রায় বন্য গাই)
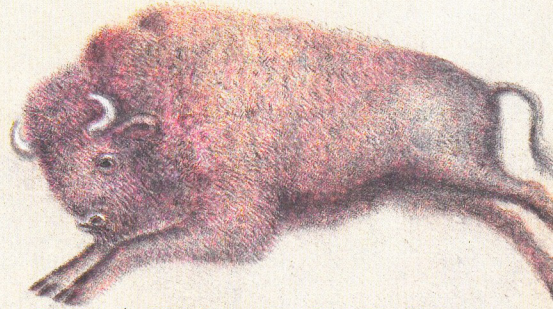
বাওয়ার বার্ডরা কয়েক জাতের হয়ে থাকে। তাদের পরস্পরের মধ্যে রঙের বাহারে আর আয়তনে প্রভেদ দেখা যায়, কিন্তু তাদের সকলেরই এমন একটা বৈশিষ্ট্য আছে যা মানুষকে বিস্মিত ও পুলকিত করে, আর তা থেকেই জন্ম নেয় অসংখ্য কল্পনা ও বড় অদ্ভুত অদ্ভুত অনুমান। ব্যাপারটা এই যে এদের পুরুষবর্গ পর্ণকুটির কিংবা কুঞ্জ নির্মাণ করে এবং এমন সমস্ত অসাধারণ বস্তু সংগ্রহ করে যা দিয়ে তারা স্ত্রী-পাখিদের বশে আনে।

বাওয়ার বার্ডরা তাদের কুঞ্জকে বানানো ও সাজানোর পেছনে যে শ্রম ব্যয় করে তা থেকে এটাই প্রতিপন্ন হয় যে তাদের জীবনে 'কথাবার্তার' তাৎপর্য বিরাট — যেমন বিরাট অন্যান্য জীব-জন্তুর জীবনেও।

বোম্‌বার্ডিয়ার পোকা

দস্তুরমতো মোটা মোটা কাঠের গংড়ি দিয়ে পথ থেকে আলাদা করে রাখা খোঁয়াড়গংলির ধার দিয়ে আমরা অরোক্স পালনাগারের অধিকর্তার সঙ্গে যাচ্ছিলাম। একটা নবজাত অরোক্সকে দেখতে আমার বড় সাধ হল। কিন্তু নবজাত অরোক্সটা যেখানে ছিল সেই খোঁয়াড়ের বেড়ার কাছাকাছি আসতে না আসতে মাদী অরোক্স ঢং মারার ভঙ্গিতে আধ মিটার লম্বা লম্বা ধারাল শিং সমেত বিশাল মাথা নোয়াল। আমরা আগের মতোই এগিয়ে আসতে থাকলাম। তাতে অরোক্সটা হঠাৎ জায়গা ছেড়ে ট্রেনের গতিতে আমাদের দিকে ধেয়ে এলো। আমি সঙ্গে সঙ্গে বংঝতে পারলাম যে খোঁয়াড়ের বেড়া তার কাছে কোন বাধা নয়, বংঝলাম যে এই গংড়িগংলি দেশলাইয়ের কাঠের মতো ভেঙে যাবে, অরোক্সের শিং অবলীলাক্রমে মানংষকে এফোঁড়-ওফোঁড় করে দিতে পারে। বলাই বাহংল্য, আমি ছিটকে এক পাশে সরে গেলাম। আমার সঙ্গীটি কিন্তু একেবারেই নড়লেন না। অরোক্সদের প্রকৃতি তিনি ভালোমতোই জানতেন। এবারেও তার কোন ভুল হল না। বেড়ার মিটারখানেক দংরে থাকতে অরোক্স থমকে দাঁড়াল এবং মংখ ফিরিয়ে শান্তভাবে রওনা দিল উল্‌টো দিকে, যেখানে ঘাসের মধ্যে বাছংরটা শংয়ে ছিল। এ সময় সে এমন প্রসন্নমনে লেজ নাড়াতে লাগল যে এক সেকেন্ড আগেও সে যে ক্ষিপ্ত হয়ে আমাদের তাড়া করতে এসেছিল তা ধারণা করাই কঠিন ছিল। কিন্তু বাছংরের কাছে এসে সে এদিক-ওদিক তাকাল। আমরা এখনও এখানে আছি দেখে সে দৃঢ়সঙ্কল্প নিয়ে ঘংরে দাঁড়াল, আবার মাথা নীচু করে আমাদের দিকে তেড়ে এলো। তিন বার, চার বার, পাঁচ বার ঐ একই ঘটনা ঘটল। অবশেষে, ওর হংমকি যে কাজ করছে না এবং আমাদেরও চলে যাবার যে-কোন মতলব নেই এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত হওয়ার পর অরোক্স নিজেই চলে যাবে বলে ঠিক করল। সে চলল ঝোপ-ঝাড়ের উদ্দেশে, নবজাত বাছংরটি টলমল পায়ে চলল তার পিছন পিছন।

গোখ্‌রো সাপ

আমি অবশ্য ঠিকই বংঝলাম যে অরোক্স আমাদের ভয় দেখাচ্ছিল মাত্র। কিন্তু আমার পাশে অভিজ্ঞ মানংষ না থাকলে হংমকিতে নিঃসন্দেহে কাজ হত!

বক

'লাগতে এসো না, সরে যাও, নইলে খারাপ হবে কিন্তু' — এই মর্মে সতর্ক করে দেওয়ার জন্য হংমকির ভঙ্গি অথবা চাল জীব-জন্তুদের মধ্যে ব্যাপক প্রচলিত। কীট-পতঙ্গ, পাখি, জন্তু-জানোয়ার — সকলেই ভয় দেখাতে ও হংমকি দিতে ভালোবাসে।

ধর বোম্‌বার্ডিয়ার নামে ছোট্ট একটা পোকা ছংটে চলেছে। সে না পারে কামড়াতে, না পারে আঁচড়াতে। কিন্তু তার আত্মরক্ষার উপায় আছে — সে তীব্র গন্ধযংক্ত তরল পদার্থের 'গংলি ছংড়তে' পারে। অথচ

বিপদের সময়ও সে সঙ্গে সঙ্গে এ কাজ করে না — আগে মাথায় ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে ভয় দেখাবে: 'পালা, গুলি করব বলছি!' এই ভঙ্গি শত্রুর ওপর কাজ করে। এমন এক জাতীয় পোকাও আছে যে গুলি ছুঁড়তে পারে না, অথচ বোম্‌বার্ডিয়ার-এর মতো হুমকির ভঙ্গি করতে পারে — এটা নেহাৎ অকারণ নয়। এর সাহায্যে সে শত্রুদের হাত থেকে নিজের প্রাণ বাঁচাতে পারে।

বিষধর গোখ্‌রো সাপ আক্রমণ করার আগে ফণা ধরে। এটাও হুমকি — সাবধানবাণী।

হাঁস শত্রুকে হুমকি দেখানোর সময় লম্বা করে গলা বাড়িয়ে দেয়; বক হঠাৎ অনেক বড় আকার ধারণ করে — তার পালক খাড়া হয়ে ওঠে, সে যেন আঘাত হানার জন্য লম্বা করে গলা বাড়িয়ে দেয়; রাজহাঁস দুই ডানা ছড়িয়ে দেয়, ঘাড় ফোলায়, পিঠের দিকে মাথা টেনে আনে।

এক কথায়, চূড়ান্ত কার্যকলাপের আগে জীব-জন্তুরা তখনই ভীতিপ্রদর্শনের, সতর্কীকরণের ভঙ্গি দেখায়, যখন শত্রু কাছাকাছি চলে আসে, যখন জীবনের আশঙ্কা দেখা দেয়। কিন্তু হুমকি প্রদর্শনের বিশেষ এক ধরনের ভাষা আছে, যে ভাষায় জীব-জন্তুরা কেবল তাদের জ্ঞাতি-গোত্রদের সঙ্গে কথা বলে। এ ভাষার নাম 'সীমান্তপ্রহরামূলক' ভাষা এবং তা জীব-জন্তুদের যার যার সাম্রাজ্য রক্ষার কাজে লাগে। আর এই সাম্রাজ্য তারা রক্ষা করে কেবল 'স্বগোত্রীয়দের' হাত থেকে। অন্য জাতের প্রতিনিধিদের দিকে তারা নজর দেয় না। যেমন নীলকণ্ঠ পাখিকে স্টার্লিং পাখি তার নিজের এলাকা থেকে খেদাবে না, কুকুরের দিকে ত মনোযোগই দেবে না। কিন্তু অন্য একটি স্টার্লিং যদি এসে পড়ে, তাহলে তৎক্ষণাৎ তাকে হুমকি দিতে থাকবে, সে যাতে এলাকা ছেড়ে চলে যায় তার জন্য দাবি করবে। আগন্তুকটা কান না দিলে চূড়ান্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করবে।

স্টিক্‌ল-ব্যাক মাছ

স্টিক্‌ল-ব্যাক মাছ — কেবল রসিক প্রণয়ীই নয়। নিজের সাম্রাজ্য প্রতিরক্ষার ব্যাপারেও সে নির্ভীক। বাসার কাছাকাছি অন্য কোন স্টিক্‌ল-ব্যাক এলেই হল, অমনি মালিক জঙ্গী নাচন নাচতে নাচতে তার দিকে ধেয়ে যাবে। নাচে কাজ না হলে স্টিক্‌ল-ব্যাক মাছ মাথা উল্‌টে নীচে পড়ে গিয়ে ক্ষিপ্ত হয়ে জলের তলাকার বালি খুঁড়তে থাকবে। অমনিতে দেখতে গেলে এতেই অপরের সীমানায় হামলাকারী বেহায়ার সম্পূর্ণ ভয় পেয়ে যাওয়ার কথা। কিন্তু এতেও যদি কাজ না হয়, তাহলে মাছ সর্বোচ্চ পর্যায়ের হুমকির আশ্রয় নেয় — সে শত্রুর দিকে কাত হয়ে ঘুরে যায় এবং পেটের বড় বড় কাঁটা বার করে।

পাখিরাও তাদের এলাকায় বাইরের কারও আগমন একেবারে পছন্দ করে না। যেমন, শঙ্খচিলেরা তাদের ভালো-লাগা জমির ত্রিসীমানায় শত্রু দেখা দিলে তার মুখোমুখি হয় এবং মাথা নীচু করে হেঁট হয়ে মারাত্মকভাবে ঘাস খুঁটতে থাকে কিংবা বালিতে কামড় দিতে থাকে। মাঞ্চুরীয় সারস গলা সামনে বাড়িয়ে দিয়ে হিস্‌হিস আওয়াজ করতে করতে শত্রুর দিকে ধেয়ে যায়। মনে হয় এই বুঝি সে চঞ্চুর অসিফলক তাকে বিঁধিয়ে দেবে। কিন্তু সচরাচর তা হয় না: উট্‌কোটাকে সতর্ক

মাঞ্চুরীয় সারস

করে দেওয়াই যথেষ্ট, সে যুদ্ধের আহ্বান গ্রহণ না করে রণে ভঙ্গ দেয়।
কিন্তু ভীতিপ্রদর্শনের ভঙ্গি অর্থাৎ 'ভাগ বলছি!' — এই নির্দেশ সবসময়ই যে শত্রুর ওপর কাজ করে এমন নয়। কখনও কখনও শত্রুর সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষও বেধে যায়।

ডায়মন্ড স্নেক (র‍্যাট্‌ল স্নেক গোত্রীয়)

একটা পুরনো বেড়ার ওপর বসন্তকালে মাছিরা রোদ পোহায়। সঙ্গে সঙ্গে ঘুরঘুর করতে দেখা যায় আটপেয়ে দস্যু লাফানে-মাকড়সাকে। সে গুঁড়ি মেরে মাছির দিকে এগিয়ে আসবে তারপর কৌশলে তার পিঠের ওপর লাফিয়ে পড়বে। এই বেড়ায় এ জাতের মাকড়সা সম্ভবত বেশ কয়েকটি, তবে তাদের প্রত্যেকের নিজস্ব জায়গা আছে। কড়াকড়ি সীমানির্দেশ অবশ্য নেই, তবে তারা চেষ্টা করে একে অন্যের চেয়ে দূরে দূরে থাকতে। আর নেহাৎই যদি মুখোমুখি হয়ে যায়, তাহলে... 'বটে! খবরদার! এক্ষুনি মজাটা টের পাবি!' — সামনের পাগুলি তুলে, চোয়াল চওড়া করে হাঁ তুলে মাকড়সারা একজন আরেক জনকে যেন এই কথাই বলে। তারা ধীরে ধীরে কাছাকাছি হতে থাকে, মাথায় মাথা ঠেকিয়ে সংঘর্ষ বাধায়, তারা বিষধর দাড়া একে অন্যকে বিঁধিয়ে দিতে প্রস্তুত, কিন্তু... শেষ পর্যন্ত শান্তভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে সরে যায়। দুজনেই দেখাল যে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত, কিন্তু কেউই যুদ্ধে নামল না, যেন বুঝতে পেরেছে যে প্রতিটি সাক্ষাৎকারে মাকড়সারা যদি মারাত্মক সংঘর্ষে লিপ্ত হত, তাহলে তারা বহুকাল আগেই একে অন্যকে ধ্বংস করে ফেলত এবং পৃথিবীতে আর লাফানে-মাকড়সাদের অস্তিত্ব থাকত না।

লাফানে-মাকড়সা

উত্তর আমেরিকার দক্ষিণে ডায়মন্ড স্নেক দেখতে পাওয়া যায়। এরা হল র‍্যাট্‌ল স্নেকদের মধ্যে সবচেয়ে বৃহদাকার ও সবচেয়ে বিপজ্জনক। দৈর্ঘ্যে তারা আড়াই মিটার পর্যন্ত হয়, ওজনে — দশ কিলোগ্রাম পর্যন্ত।

এ জাতের সাপদের প্রত্যেকের আছে শিকারের নিজস্ব এলাকা, তাই মনে হতে পারে যে সেই এলাকায় প্রতিদ্বন্দ্বীর আগমন ঘটলে তার অদৃষ্টে মারাত্মক বিপদ আছে, কেননা এই সাপের বিষ গোখ্‌রোর বিষের দশ

স্যান্ড-লিজার্ড বা ছটফটে গিরগিটি

অ্যান্টিলোপ

গুণ, তার দাঁত মোটা চামড়া ভেদ করেও ফুটে যেতে পারে। কিন্তু ঐ এলাকার মালিকেরও অবস্থা খারাপ হতে পারে — যেহেতু তার শত্রুও ঐ একই অস্ত্রের অধিকারী। সাপদের যদিও নিজস্ব বিষে আক্রান্ত হওয়ার তেমন ধাত নেই, তবু মরিয়া সংঘর্ষে আঘাত লাগলে তা প্রাণঘাতী হতে পারে।

সাপদুটো শেষ পর্যন্ত পরস্পরকে আক্রমণ করতে চলেছে। আক্রমণ অবশ্য গোড়ার দিকে অনেকটা নাচের মতো: ওরা দুটিতে পাশাপাশি, মাথায় মাথা ঠেকিয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে মন্থরগতিতে চলেছে, পরস্পরকে আক্রমণ করার কোন চেষ্টাই তাদের দেখা যাচ্ছে না। 'প্রথম রাউন্ড' চলল মিনিট পাঁচেক, তারপর সাপদুটো বুকে হেঁটে দুদিকে সরে গেল।

বিরতির পর ওরা আবার এসে মিলতে থাকে — মাথা অনেক উঁচুতে তুলে কাছাকাছি হতে থাকে — জাপ্‌টাজাপ্‌টি করে। এই ভাবে একে অন্যকে জড়িয়ে ধরে তারা কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে, আলাদা হয়ে সরে যায়, আবার এসে মেলে, আবার একে অন্যকে জড়িয়ে ধরে। যতক্ষণ দুজনেরই পরিস্থিতি একরকম ততক্ষণ তারা কেবল 'নাচে'। কিন্তু শেষ কালে একজনের পরিস্থিতি অপেক্ষাকৃত লাভজনক মনে হল — তার পক্ষে শত্রুর ঘাড় আষ্টেপৃষ্ঠে চেপে ধরা সম্ভব হল। তৎক্ষণাৎ তড়িৎগতিতে হেঁচকা টান — শত্রু চিৎপাত। বিজয়ী অনায়াসে তার ওপর প্রতিশোধ নিতে পারে। কিন্তু সে তা করে না। তাছাড়া লড়াইয়ের সময়ও ওদের কেউই দাঁত ব্যবহার করে না। দাঁতের ভেতরে যে কী বিপদ

আছে সাপেরা যেন তা জানে, তাই 'এলাকাসংক্রান্ত বিরোধের' মীমাংসা তারা যুদ্ধ-যুদ্ধ খেলার মধ্য দিয়ে করার পক্ষপাতী। বিজয়ী পরাজিতকে খানিকক্ষণ ধরে রাখার পর ছেড়ে দেয়, পরাজিত তখন সেই জায়গা ছেড়ে চলে যায়।

স্যান্ড-লিজার্ড নামে পরিচিত গিরগিটিরা একে অপরকে ভয় দেখানোর পর যদি দেখে যে ভীতিপ্রদর্শনে কাজ হচ্ছে না তখন পরস্পরের ঘাড় কামড়াতে শুরু করে। এক্ষেত্রে কামড় পালাক্রমে কে কখন দেবে এবং তার শক্তি কেমন হবে সে ব্যাপারে কড়াকড়ি নিয়ম আছে। গিরগিটিদুটির একটিও এমনভাবে কামড়ায় না যাতে শত্রু আঘাত পায়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ওদের একজন টিকতে পারল না, তখন দ্বন্দ্বযুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটল। বিজয়ী সেই এলাকায় থেকে যায়, আর বিজিত নূতন বাসস্থানের সন্ধানে বেরিয়ে পড়ে।

হার্মিট-ক্র্যাব

দ্বন্দ্বযুদ্ধের যাবতীয় নিয়মকানুন সম্পর্কে ওয়াকিবহাল এবং সে নিয়মকানুন কঠোরভাবে মেনে চমৎকার দ্বন্দ্বযুদ্ধ চালায় খুরযুক্ত প্রাণীরা — অ্যান্টিলোপ, হরিণ আর কপিল বর্ণের হরিণেরা। তাদের দ্বন্দ্বযুদ্ধ নানাভাবে শুরু হতে পারে — কেউ কেউ পরস্পরের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সামনের পায়ের খুর দিয়ে মাটি খোঁড়ে, যেন প্রতিপক্ষকে অগ্র-পশ্চাৎ বিবেচনা করে বিনাযুদ্ধে যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে যেতে বলছে; কেউ কেউ গোল হয়ে ঘোরে; আবার কেউ কেউ লড়াইয়ে নামার আগে পাশাপাশি চলতে থাকে। তারপর শুরু হবে লড়াই। সত্যিকারের মল্লযোদ্ধাদের মতো ওদেরও রাউন্ড আছে, রাউন্ডের মাঝখানে বিরতি আছে। জিরিয়ে নিয়ে দুই পক্ষ আবার এসে মিলিত হয়, এই ভাবে চলতে থাকে, যতক্ষণ না ওদের একজন অপরের প্রাধান্য স্বীকার করে নেয়। পরাজিতটি পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে, কিন্তু বিজয়ী তাকে অনুসরণ করে না, যেহেতু দ্বন্দ্বযুদ্ধের প্রধান উদ্দেশ্য প্রতিপক্ষকে হত্যা করা কিংবা আহত করা নয়, তাকে নিজের শক্তির পরিচয় দেওয়া।

চিতেল হরিণ

যুদ্ধারম্ভের পূর্বে প্রতিদ্বন্দ্বীরা পরস্পরের উদ্দেশে যে অঙ্গভঙ্গি বিনিময় করে তাকে অনুবাদ করা যেতে পারে মোটামুটি এই ভাবে: 'ভাগ, নইলে ভালো হবে না বলছি।' অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাদের একজন পালায়। যদি নেহাৎই না পালায়, তাহলে যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়।

যুদ্ধের শেষে আবার অঙ্গভঙ্গি (অথবা একাধিক রকমের অঙ্গভঙ্গি) করতে হয়, মানুষের ভাষায় যার অর্থ দাঁড়ায়: 'হার মানছি।'

কোন কোন জীব-জন্তু অঙ্গভঙ্গির সাহায্যে একথা না জানিয়ে বিনয়সূচক বা বশ্যতামূলক কোন ভঙ্গি করে। যেমন লেজ গুটিয়ে নেয় কিংবা বিজয়ীর পদতলে শুয়ে পড়ে। এ ধরনের ভঙ্গি, দৃষ্টান্তস্বরূপ, কুকুরছানা আর কোন কোন পাখির বৈশিষ্ট্যসূচক।

হার্মিট-ক্র্যাব নামে এক ধরনের কাঁকড়া বাসোপযোগী কোন খোল দখল করতে গিয়ে যুদ্ধে পরাস্ত হলে কাত হয়ে কিংবা চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ে, তখন প্রতিপক্ষ তার উপর আক্রমণ করা থেকে ক্ষান্ত হয়।

স্যাণ্ড-লিজার্ড জাতের গিরগিটিদের মধ্যে যেটি কামড় সহ্য করতে পারল না, সেটি বিজয়ীর দিকে লেজ ঘুরিয়ে দাঁড়িয়ে পলায়নের ভঙ্গিতে লাফ দিতে শুরু করে। কুকুর ও নেকড়েরা বিজয়ীর সামনে এগিয়ে দেয় তাদের দেহের দুর্বলতম অংশ — কণ্ঠদেশ। কিন্তু বিজয়ী কখনও সে সুযোগ কাজে লাগায় না। 'হার মানছি' — এই সঙ্কেত তার মনে যথোপযুক্ত অনুভূতির উদ্রেক করে — সে পরাজিতকে সবসময় 'ক্ষমা করে'।

আজ যে পরাজিত, সেও কয়েক বছর বাদে আরও শক্তিমান ও অভিজ্ঞ হয়ে কাউকে জীবন দান করবে, যখন সে অঙ্গভঙ্গির সাহায্যে বলবে: 'হার মানছি।'

শক্তিমানেরা চিরকালই সদাশয়।

খঞ্জন

চতুর্থ অধ্যায়

পশু-পাখির আরও ভাষা

ঘ্রাণের ভাষা। নাচের ভাষা। ধ্বনির ভাষা। চলনের ভাষা... এগুলিও পশু-পাখিদের মেলামেশার, সংকেতপ্রদানের সমস্ত উপায় নয়, তাদের কথাবার্তা চালানোর সব ভাষা এর মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়।

পশু-পাখিরা রঙের তফাত ধরতে পারে। এক সময় একটা কৌতূহলজনক পরীক্ষা করা হয় — মশারা রঙের তফাত ধরতে পারে কিনা এই নিয়ে বিজ্ঞানীদের মধ্যে বিতর্ক দেখা দেয়। এটা যাচাই করে দেখার জন্য একটা ঘনক্ষেত্র নিয়ে তাকে নানা রঙে রাঙানো হল। তারপর ঘনক্ষেত্রটিকে মশকসংকুল স্থানে রেখে পর্যবেক্ষণ করা হতে লাগল। এতে দেখা গেল যে একটা রঙের উপর খুব বেশি সংখ্যক মশা এসে বসেছে, অন্য রঙের উপর — অপেক্ষাকৃত কম, আরেকটির উপর — আরও কম, আর কোন একটা রঙের উপর মশারা একেবারেই বসে নি। তার মানে, এই নয় যে যে-কোন জায়গায় বসলেই তাদের চলে! লোকে এ থেকে এক বাস্তব সিদ্ধান্তে এলো: যারা মশকসংকুল স্থানে কাজ করে তাদের পোশাক মশাদের অপ্রীতিকর রঙে রাঙাতে লাগল।

এদিকে মশারা কিন্তু অমনি অমনি, নিছক সৌন্দর্যের খাতিরে রঙের পার্থক্য করে না। তাদের কাছে রঙের ব্যবহারিক তাৎপর্য আছে। তা না হলে তাদের অনেকে খাদ্যই খুঁজে বার করতে পারত না। কিন্তু, দেখা গেছে রঙ তাদের পরস্পরের মধ্যে কথাবার্তা চালাতে এবং বন্ধু ও শত্রুকে জানতেও সাহায্য করে।

রঙ যোগাযোগের অতি সাধারণ উপায় হিশেবেও কাজ করে। 'আমাকে ছুঁয়ো না, আমি বিচ্ছিরি' — গুবরে পোকার গোটা চেহারা যেন এই কথাই বলছে; তার লাল পিঠ ভালোমতো দৃষ্টিগোচর হয় এবং সহজেই মনে রাখা যায়। ঐ পিঠ দেখিয়ে সে নিশ্চিন্তভাবে ডালের ওপর ঘুরঘুর করে বেড়ায়।

সোনাব্যাঙ

সোনাব্যাঙও এই পন্থা অবলম্বন করে। তারা নিজেদের জ্বলজ্বলে চাকা চাকা দাগওয়ালা পেট আর গলা দেখিয়ে যেন বলতে চায় যে তাদের ছোঁয়া ঠিক হবে না। শত্রুদের ভয় দেখানোর এরকম অনেক উপায় আছে। কিন্তু ছোপ ও রঙের সাহায্যে নিজেদের মধ্যে 'কথা বলার' বেশ কিছু উপায়ও আছে।

বহু পাখির রঙিন ছোপ তাদের শনাক্তকরণের চিহ্ন হিশেবেও কাজ করে: যেমন হাঁসের ডানায় আরশির মতো চকচকে পালক। এর সাহায্যে তারা অন্য জাতের হাঁস থেকে নিজের জাতের হাঁসদের পার্থক্য নির্ণয় করে, জ্বলজ্বলে পালকের উদ্‌গম দেখে স্ত্রী-হাঁসেরা পুরুষ-হাঁসদের চিনতে পারে। কিন্তু সবচেয়ে কৌতূহলজনক ব্যাপার হল রঙিন ছোপের সাহায্যে কথোপকথন।

খঞ্জনপাখির লেজের দুই প্রান্তবর্তী পালকের শেষভাগ সাদা। কিন্তু তা সবসময় চোখে নাও পড়তে পারে, চোখে পড়ে একমাত্র তখনই, যখন পাখি কিছু একটা বলতে চায়। এই উদ্দেশ্যে সে হাত-পাখার মতো করে লেজ ছড়িয়ে দেয় তার ফলে ছোপ স্পষ্ট দেখা যায়।

খঞ্জন পাখি নিশ্চিন্তে উপকূল ধরে চলেছে লেজ নাচাতে নাচাতে। হঠাৎ লেজ পরিণত হল হাত-পাখায়, দেখতে দেখতে এই খঞ্জনটির কাছে এসে জুটল আরও একটি খঞ্জন।

কালোশিরা পাখিদেরও লেজে এ ধরনের ছোপ আছে। পাখি খাবারের খোঁজ পেল কি না পেল অমনি লেজের ছোপের সাহায্যে পাঠিয়ে দিল সঙ্কেত: 'এখানে, আমার কাছে এসো, এখানে খাবার আছে!'

শীতকালে বনে কিংবা বাগানে যদি কখনও বুকের কাছে লাল রঙওয়ালা সুন্দর বুলফিঞ্চ পাখি আর তাদের ছাইরঙা সঙ্গিনীদের দেখতে পাও তাহলে লক্ষ্য করে দেখো। পাখিদের অসাধারণ কথাবার্তার পরিচয় পাবে।

বুলফিঞ্চরা যতক্ষণ নিশ্চিন্তে বসে আছে ততক্ষণ কথোপকথনের তেমন একটা আবশ্যক নেই। কিংবা তারা তাদের 'জিউ-জিউ' ডাক বিনিময় করে বাক্যালাপ করতে পারে। কিন্তু পাখিদের ঝাঁক হয়ত ঠিক করল যে স্থানান্তরে উড়ে যাবে। তৎক্ষণাৎ পাঠানো হল সঙ্কেত: 'অবগতির জন্য বলছি, ওড়ার জন্য তৈরি হও!' এই সঙ্কেত হল পাখিদের কটিদেশের সাদা ছোপ। যতক্ষণ তারা বসে থাকে ততক্ষণ ছোপ দেখা যায় না — ডানায় ঢাকা থাকে। কিন্তু ওড়ার আগে পাখিরা ডানা নামিয়ে দেয়, তাতে ছোপগুলি দৃষ্টিগোচর হয়, এমনকি দূর থেকেও তাদের বেশ লক্ষ্য করা যায়। যাতে সকলেই সেগুলি দেখতে পায় সেই উদ্দেশ্যে বুলফিঞ্চরা বার কয়েক বিভিন্ন দিকে ঘোরে। ওড়ার সময় যারা পিছিয়ে পড়ে তাদের কাছে এই ছোপগুলি দিব্যি দিকনির্দেশের কাজ করে।

চিতেল হরিণদেরও সঙ্কেত অনেকটা এই ধরনের। তাদের পশ্চাৎদেশে আছে বেশ বড় আয়তনের সাদা ছোপ — আরশির মতো ঝকঝকে। চিতেল হরিণ ঝোপের ভেতরে, গাছপালার মাঝখানে ভালোমতো লুকিয়ে পড়তে পারে — এটা তার আত্মরক্ষার উপায়। বিপদ দেখা দিলে সে পালায়। ঘন ঝোপঝাড়ের মধ্যে হরিণছানার পক্ষে তার মাকে ভালো করে নজরে আনা কঠিন, বিশেষত মা যদি ইতিমধ্যে পালিয়ে কয়েক পা দূরে সরে যায়। হরিণছানা যাতে হারিয়ে না যায় তার জন্য মা-হরিণের আরশি আছে। এই আরশি সবুজ গাছপালার মাঝখানে দিব্যি চোখে পড়ে, তা যেন হরিণছানাকে বলে: 'আমি এখানে, ছুটে

হলদে বান্টিং

এখানে চলে আয়!' কিন্তু মা-হরিণ যদি সাদা লোমে ঢাকা তার ছোট্ট লেজটা নামিয়ে দেয় তার অর্থ দাঁড়াবে: 'দাঁড়া! এগোস না!'

মরুভূমিতে ছোট এক জাতের গিরগিটি বাস করে। মরুভূমির বহু বাসিন্দার মতো এই গিরগিটিও বালিরঙা। তবে সে এমনভাবে লুকিয়ে পড়তে পারে যে তার জ্ঞাতিগোত্রদেরও সাধ্যি নেই তাকে খুঁজে বার করে। গিরগিটি যখন মনে করে যে তাকে অন্যেরা দেখুক তখন সে তার লেজ তোলে। লেজের তলার দিকটা ডোরাকাটা — ফ্রণ্টিয়ার পোস্ট-এর মতো হালকা আর গাঢ় রঙে 'ছোপান'। গিরগিটি তার লেজ উঁচায়, পোস্টটাও তখন দূর থেকে চোখে পড়ে। এর সাহায্যে সে যেন বলে: 'আমি এখানে, চলে এসো!'

বুলফিঞ্চ

রেডস্টার্ট পাখিদের পুরুষবর্গ ছোপান রঙের সাহায্যে অন্য বিষয়ে কথাবার্তা বলে: পুরুষ-রেডস্টার্ট স্ত্রী-রেডস্টার্টের আগে উড়ে এসে উপযুক্ত কোটরের ভেতরে বাসার খোঁজখবর করে। কিন্তু এখানেই একটা মুশকিল দেখা দেয় — বাসা আছে অথচ সঙ্গিনী নেই। সঙ্গিনীর সন্ধানে যদি বের হওয়া যায়, তাহলে অন্য পাখি এসে বাসা দখল করে নেবে। কিন্তু পুরুষ-রেডস্টার্ট এই পরিস্থিতি থেকে উদ্ধারলাভের উপায় বার করেছে: সে কোটর থেকে নিজের জ্বলজ্বলে বাদামী রঙের লেজটি বার করে দিয়ে হাত-পাখার মতো ছড়িয়ে দেয়। লেজ দূর থেকে নজরে পড়ে — লেজটা জ্বলজ্বলে বেরিয়ে থাকে পতাকার মতো। স্ত্রী-পাখিরা বেশ ভালোমতোই বুঝতে পারে এর অর্থ কী, তারা আর কালবিলম্ব করে না।

ছোপ ধরা রঙের ভাষা বহুবিচিত্র. পশু-পাখিরা বলতে গেলে, জীবনের সর্বক্ষেত্রে তা ব্যবহার করে থাকে। পশু-পাখিরা 'আলোঝলমলে' ছোপেরও আশ্রয় গ্রহণ করে — কথা বলে আগুনের সাহায্যে। সে আগুন যতদূর হতে পারে সত্যিকারের হওয়া সত্ত্বেও পুরোপুরি সত্যিকারের নয়।

চিতেল হরিণ

আমাদের অঞ্চলে জোনাকি পোকারা বাস করে — এরা হল ধূসর-বাদামী রঙের খুদে পোকা। দিনের বেলায় তার কোন লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে না। কিন্তু রাতের বেলায় সে হয়ে যায় উড়ন্ত এক রত্তি বাতি। ঘাসের ভেতরে স্থির হয়ে বসে থাকে আরেক জাতের জোনাকিরা —

জোনাকি

রেডস্টার্ট পাখি

তাদের বাতি আরও উজ্জ্বল। এই পতঙ্গরা কীটের মতো দেখতে, আসলে এরা মোটেই কীট নয় — এরাও উড়ন্ত পোকার মতোই পোকা। কেবল স্ত্রী-জাতের। তোমাদের সম্ভবত জানা আছে যে কোন কোন কীট-পতঙ্গের পুরুষ-সম্প্রদায়ের সঙ্গে স্ত্রী-সম্প্রদায়ের পার্থক্য বিরাট।

পুরুষ-জোনাকি উড়তে উড়তে আলোক-সঙ্কেত দেয়: 'আমি তোমাকে খুঁজছি! তুমি কোথায়?' স্ত্রী-জোনাকি ঘাসের ভেতরে বসে থাকে, সে জবাব দেয়: 'আমি এখানে!' পুরুষ-জোনাকি আলোর সঙ্কেত দেখামাত্রই তার দিকে উড়ে যায়।

আমাদের দেশে এক জাতেরই জোনাকি আছে, তাই তাদের সঙ্কেত ততটা ভাবব্যঞ্জক নয়। পোকা-মাকড়দের নিজেদের কথা বলার দরকার হয় না — তাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ হল পরস্পরকে দেখতে পাওয়া। কিন্তু গ্রীষ্মমণ্ডলীয় বনভূমিগুলিতে, যেখানে বহুবিধ জাতের জোনাকি আছে, সেখানে 'আগুনের ভাষা' বহুবিচিত্র। এ না হয়ে উপায় নেই: সকলে যদি একই ভাবে আলো মিটমিট করে, তাহলে ওরা নিজেদের জাতিগোত্রকে চিনবে কী করে? তারা তাহলে যে-কোন আলোর ওপর উড়ে আসত, আর অধিকাংশ ক্ষেত্রেই হয়ত ভুল করে বসত। এই কারণে এখানে প্রতিটি জোনাকির আছে নিজস্ব 'দীপের ভাষা'। যেহেতু বিভিন্ন জাতের জোনাকি অনেক, সেই হেতু ভাষাও অনেক। কারও কারও বাতি স্থিরভাবে জ্বলে, কারও বা এই নেভে, এই জ্বলে। কিন্তু এটাও সব না: কারও কারও আলো ঘন ঘন নেভে আর জ্বলে, কারও কারও — কদাচিৎ; কারও কারও — অনেকক্ষণ জ্বলে, কারও কারও — অল্পক্ষণ; কেউ কেউ ওপরে ওড়ার সময় বাতি জ্বালায়, কেউ বা নীচে নামার সময়। কোন কোন জোনাকি একা সঙ্কেত দেয়, কেউ কেউ গোটা দল বেঁধে আলো জ্বালায় আর নেভায়। আবার তাদের বাতিও নানান আকারের — আছে গোল ও লম্বাটে, আছে তারের মতো দীর্ঘ। গ্রীষ্মমণ্ডলীয় আমেরিকায় এক জাতের পতঙ্গ আছে যাদের বুকের ওপর কিংবা পিঠের ওপর দুটো বড় বড় বাতি। বাতিগুলি হেডলাইটের মতো, তাই পতঙ্গদের নাম দেওয়া হয়েছে 'মোটরগাড়ি'। এরা তাদের 'হেডলাইটের' তেজ কম-বেশি করতে পারে। তাদের আরও একটি বাতি আছে — লেজের কাছে। এটি মাটিতে নামার সময় ও আকাশে ওড়ার মুহূর্তে হালকা সবুজ কিংবা হালকা হলুদ আলো জ্বালে।

আবার এমন পতঙ্গও আছে যাদের বাতি লাল আর সবুজ। এদের

নাম 'ট্রাফিক লাইট' পোকা। এই পোকাদের স্ত্রী-সম্প্রদায় বড় আকারের সাদা শুঁয়োপোকার মতো দেখতে, তাদের দু'পাশে আছে সবুজ বাতির সারি আর মাথার ওপর — একটা লাল বাতি। এরা দরকার হলে একসঙ্গে সবগুলি কিংবা মাত্র একটি 'লাইটও' জ্বালাতে পারে।

সমুদ্রের গভীরে আলোকসজ্জার বৈচিত্র্য আরও বেশি। সেখানে প্রায় চোখে না পড়ার মতো একরত্তি সামুদ্রিক জীব থেকে শুরু করে গভীর জলের বিশাল বিশাল মাছ পর্যন্ত — অনেকেই আলোর ভাষায় কথা বলে। কোন কোন মাছের শরীর আলোক বিচ্ছুরণ করে, কারও বা মাথার ওপর উজ্জ্বল সার্চ লাইট। এমন মাছ আছে যারা উৎসবকালীন জাহাজের মতো আলোকমালায় সজ্জিত, আবার এমন মাছও আছে যারা মুখ খুললেই মনে হয় তাদের ভেতরে অগ্নিশিখা লকলক করছে।

অন্ধকারের মধ্যে পরস্পরকে চিনতে হলে, খুঁজে বার করতে হলে, 'কথা বলতে' গেলে এটাও অবশ্যপ্রয়োজনীয়।

গভীর জলের মাছ

আর কিসের ভাষা?

বিজ্ঞানীরা মনে করেন যে পৃথিবীর লোকেরা দু'হাজারেরও বেশি ভাষায় কথা বলে। পশু-পাখিদের ভাষার সংখ্যা আরও অনেক বেশি। পৃথিবীতে যত জাতের পশু-পাখি আছে তাদের ভাষাও ততগুলি — প্রায় প্রতিটি জাতের আছে নিজস্ব অ-আ-ক-খ, মেলামেশার নিজস্ব উপায়।

যেমন ধর, তোমরা জান যে প্রতিটি পাখির নিজের গান আছে (এমনকি তা যদি অন্য পাখির কাছ থেকে ধার-করা গানও হয়)। কিন্তু এমন সমস্ত পাখিও ত আছে যারা গান গাইতে পারে না। শুধু কি তাই? — তাদের কণ্ঠস্বরই নেই। তা সত্ত্বেও তারা কথা বলে। তারা কথা বলার যে-কোন উপায় বার করে।

কাঠঠোকরা
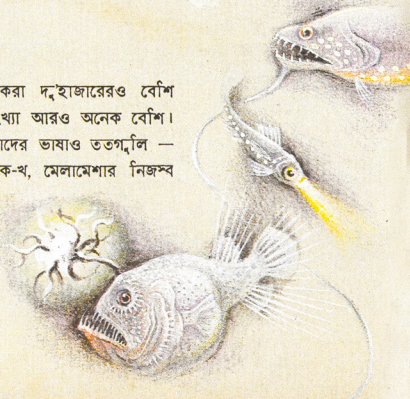
এসো, সারসের প্রসঙ্গই মনে করা যাক। পালকের বাহার বল, আর উচ্চতাই বল — সবই তার ভালো। অথচ কণ্ঠস্বর নেই বললেই চলে। কী করা যায়? এদিকে সঙ্গিনী যখন উড়ে এসে বাসার ওপর বসে তখন তাকে সম্ভাষণ জানাতে হয়, কিংবা কোন বেহায়া বাসার বেশি কাছাকাছি এলে তাকে ভয় দেখাতে হয়। সারস তাই ঠোঁট নেড়ে ঠকঠক আওয়াজ করে। নিছক ঠকঠকানি নয় — কখনও জোরে, কখনও আস্তে, কখনও ঘন ঘন, কখনও কদাচিৎ।

কাদাখোঁচা

কোন কোন পাখির ডানায় বিশেষ ধরনের খাঁজ থাকায় তারা ওড়ার সময় এক রকমের শনশন আওয়াজ বার করে। এই শনশন আওয়াজ শনাক্তকরণের চিহ্ন — অর্থাৎ, 'আমরা উড়ছি!' জ্ঞাতিগোত্রেরাও তা দিব্যি বুঝতে পারে।

কাদাখোঁচা পাখি তার নিজের পরিচয় জানায় পালকের শোভার সাহায্যে। কাদাখোঁচা যখন ওপর থেকে সেকেন্ডে ৯-১০ মিটার গতিতে হঠাৎ হুহু করে নীচে নামতে থাকে তখন তার লেজের বিশেষ পালকগুলি কাঁপতে কাঁপতে বেশ জোরাল 'ব্যা-ব্যা' আওয়াজ বার করতে থাকে।

কোন কোন পাখি কণ্ঠস্বরের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও কখনও কখনও বিভিন্ন উপায় এবং হাতিয়ারের সাহায্যেও কথা বলে। যেমন কাঠঠোকরা। কাঠঠোকরা অনেক সময়ই শুকনো গাছের ডাল বেছে নিয়ে ঘন ঘন ও জোরে জোরে ঠোঁট দিয়ে তার ওপর আঘাত করতে থাকে। কিন্তু উদ্দেশ্যটা পোকা-মাকড় বার করে আনা নয়, উদ্দেশ্য হল নিজের সম্পর্কে জ্ঞাতিগোত্রদের জানিয়ে দেওয়া। যাদের শোনা বাঞ্ছনীয় নয় তারা যাতে 'আড়ি পেতে' না শোনে সেই উদ্দেশ্যে একেক ধরনের কাঠঠোকরা একেকভাবে ঢাক পেটায়।

প্রসঙ্গত, ঢাকের আওয়াজ বহু জীব-জন্তুর মধ্যে রীতিমতো প্রচলিত ধ্বনি-সঙ্কেত।

উইপোকা

কোন কোন পোকা কাঠের ভেতরে থেকে তাদের প্রবেশপথের দেয়ালে ঘন ঘন মাথা ঠুকে নিজেদের সংবাদ জানায়। ব্যাপারটা হয়ত তেমন প্রীতিকর নয়, কিন্তু কী করা যাবে — অন্য কোন উপায় তাদের জানা নেই, অথচ নিজেদের কথা বলার বড় সাধ!

উইপোকারা কী ভাবে অনেক দূর থেকে পরস্পরকে বিপদের সংকেত পাঠায় এটা বহুকাল লোকের কাছে প্রহেলিকা হয়ে ছিল। অবশেষে সম্প্রতি এই রহস্যের মীমাংসা হয়। দেখা গেছে, প্রহরী-উইপোকারা বিপদ

দেখতে পেয়ে বাসার মুখগুলির দেয়ালে মাথা ঠুকে ঢাক পেটাতে থাকে। বাদবাকিরা এই ঠক ঠক আওয়াজ শুনতে পেয়ে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়। এই অনুমানের সত্যতা যাচাই করে দেখার জন্য বিজ্ঞানীরা বাসার মুখগুলির দেয়ালে দেয়ালে শব্দশোষী উপকরণ পেতে দিলেন। প্রহরী-উইপোকারা যখন বিপদ-সঙ্কেত বাজাতে লাগল, তখন বাকিরা সেই সঙ্কেত শুনতে পেল না। শত্রুরা অতর্কিতে উইপোকাদের বাসায় এসে হানা দিল।

ঢাক পিটিয়ে — মাটিতে সজোরে পা ও লেজ আছড়ে কথা বলে পুরোপুরি বোবা জীবেরা — ক্যাঙ্গারুরা। ঢাক পেটাতে এবং ঢাকের ভাষা বুঝতে পারার কল্যাণে কণ্ঠস্বর ছাড়াই তাদের দিব্যি চলে যায়।

ঢাকের ভাষা বোধহয় নেহাৎ মন্দ নয়, কেননা দেখা যাচ্ছে, খরগোশ এবং খরগোশজাতীয় অন্যান্য প্রাণী মোটামুটিভাবে আরও ভাষায় অধিকার থাকা সত্ত্বেও এই ভাষা ব্যবহার করে।

ক্যাঙ্গারু

স্ত্রী-মাকড়সার সঙ্গে পুরুষ-মাকড়সার কথা বলার পদ্ধতিটি বেশ কৌতূহলজনক। একে খিটখিটে মেজাজের তায় আবার ক্ষীণদৃষ্টি স্ত্রী-মাকড়সা মানানসই আয়তনের যে-কোন চলমান বস্তুর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে। এমনকি পরে যদি সে আবিষ্কারও করে যে আক্রমণ করে বসেছে নিজের জ্ঞাতির ওপর, তাও আবার এমন এক জনের ওপর যে তার জন্য উপহার নিয়ে আসছে, তাতেও সে ক্ষান্ত হবে না, যে কাজ শুরু করেছে তা শেষ করবে — মাকড়সাটাকে উদরস্থ করবে। এই কারণে পুরুষ-মাকড়সা খানিকটা সতর্কতার সঙ্গে স্ত্রী-মাকড়সার দিকে এগোয়, দূরে থাকতেই সঙ্কেত পাঠাতে থাকে: যেন বলতে চায়, আমি, তোমার প্রেমিকপ্রবর গো। তবে যা-ই হোক না কেন, সে যে প্রাণে বাঁচবে এ ব্যাপারে সে নিশ্চিত নয়। তাই স্ত্রী-মাকড়সা বেয়াড়া রকমের নড়াচড়া করেছে কি করে নি, অমনি পুরুষ-মাকড়সা লাফিয়ে নিরাপদ দূরত্বে সরে যায়। তখন ফের সবটা গোড়া থেকে শুরু হয়: পুরুষ-মাকড়সা সঙ্কেত দিতে দিতে ধীরে ধীরে স্ত্রী-মাকড়সার দিকে এগিয়ে যায়।

যে-সমস্ত মাকড়সা জাল বোনে তাদের বেলায় ব্যাপারটা খানিকটা সহজ। পুরুষ-মাকড়সা তার জাল স্ত্রী-মাকড়সার জালের দিকে প্রসারিত করে দিয়ে একটু একটু করে টান মারতে থাকে। কিন্তু এটা নিছক টান মারা নয়, এ হল সম্পূর্ণ সুনির্দিষ্ট সঙ্কেত। প্রথমে সে নিজের সংবাদ জানায়: এই যে আমি। তারপর সঙ্কেতের অর্থ হয় অন্য: ‘তোমার কাছে আসতে পারি কি?’

আমি অনেক কথাই তোমাদের বলি নি।

যেমন, বলি নি, কী ভাবে ডিম থেকে সদ্য বেরিয়ে এসে কুমীরের ছোট ছোট ছানারা তাদের মাকে ডাকতে থাকে — মার তখন কাজ হল বালি খুঁড়ে বাচ্চাদের বাইরে বের হতে সাহায্য করা।

উপসংহার

বলি নি, হাতিরা কী ভাবে কথাবার্তা বলে। হাতি আবার কণ্ঠস্বরের সাহায্যেও নিজের অনুভূতি প্রকাশ করতে পারে। যেমন, মৃদু গরগর ও সামান্য কিঁউ-কিঁউ আওয়াজ — তার মানে, আনন্দ, প্রচণ্ড গর্জন — ভয়, কর্ণভেদী বৃংহিত — আক্রমণের পূর্ব মুহূর্তে হুমকি।

হাতি ভঙ্গি করে আর অঙ্গ-সঞ্চালন করেও কথাবার্তা বলতে পারে। এক্ষেত্রে তার সহায় হয় কান আর শুঁড়।

নেকড়ে কী ভাবে কথা বলে সে সম্পর্কেও বলা যেত: মৃদু ও টানা টানা আর্তস্বর — জমায়েত হওয়ার সঙ্কেত, চড়া আওয়াজ — অনুসরণ করার নির্দেশ, ছাড়া ছাড়া ঘেউ-ঘেউ ও হুহু ধ্বনির অর্থ হল শিকার চোখে পড়েছে।

মোট কথা, জীব-জন্তুদের সমস্ত কথাবার্তার বিবরণ দিতে গেলে একটা বইয়ে কুলোবে না, লিখতে হবে এরকম আরও অনেক বই।

এ বইতে আমার উদ্দেশ্য হল তোমরা যাতে বুঝতে পার জীব-জন্তুরা কী ভাবে কথা বলে এবং মানুষের কথাবার্তার সঙ্গে তাদের কথাবার্তার পার্থক্য কী।

এটা প্রথম ব্যাপার। এবারে বলি দ্বিতীয় ব্যাপারটি।

দোহাই তোমাদের, এমন কথা ভেবো না যে জীব-জন্তুদের ভাষা কেবল বিশেষজ্ঞরাই শুনতে পারেন, বুঝতে পারেন, অধ্যয়ন করতে পারেন। অভিজ্ঞ শিকারী, পথ-আবিষ্কারক, পর্যটক — এঁরাও অনেক সময় জীব-জন্তুদের কণ্ঠস্বর চমৎকার অনুধাবন করতে পারেন। ইচ্ছে করলে তুমিও তাদের কণ্ঠস্বর আড়ি পেতে শোনার অভ্যাস করতে পার এবং বুঝতে পার পশু-পাখিরা কী নিয়ে কথা বলছে।

কাঁটাচুয়া

এক বার বসন্তকালে আমি খুব সকাল সকাল বনে এলাম। সূর্য সবে উঠেছে, পাখিদের তুমুল সমবেত কলরব তাকে সম্বর্ধনা জানাচ্ছিল। হঠাৎ বনের পরিচিত আওয়াজের মাঝখানে আমি শুনতে পেলাম কেমন যেন অদ্ভুত, দুর্বোধ্য, অপরিচিত অওয়াজ। আওয়াজ আসছিল ঝোপের ভেতর থেকে। সেটা ছিল স্পষ্টই গান। কিন্তু এমন গান আমি আর কখনও শুনি নি। গান শুরু হল চাপা গুড়গুড় আওয়াজ দিয়ে, ধীরে ধীরে পৌঁছাল উঁচু পর্দার ভাঙা ভাঙা চিঁচিঁ আওয়াজে। তারপর হঠাৎই তা কেটে গেল — বদলে শোনা গেল চড়া চটচট আর হুসহাস, কিছুক্ষণ বিরতির পর সব শুরু হল গোড়া থেকে। আমি সন্তর্পণে ঝোপের দিকে এগিয়ে গেলাম — অপ্রত্যাশিত কিছু একটা দেখতে পাব বলে মনে মনে তৈরিই হয়ে ছিলাম। কিন্তু যা দেখতে পেলাম তাতে আমার তাক লেগে গেল। ঝোপের নীচে নাকে নাক ঠেকিয়ে বসে ছিল দুটো কাঁটাচুয়া। ওরাই গান গাইছিল!

হয়ত তোমারও এমন সৌভাগ্য হবে, হয়ত তুমিও কাঁটাচুয়াদের গান গাইতে দেখতে পাবে, তাদের গান শুনতে পাবে। যদি সে সৌভাগ্য না হয় তাহলেও দুঃখ করার কিছু নেই, তোমরা আরও অনেক রকমের গান শুনতে পাবে।

তোমরা ব্যাঙেদের গান নিশ্চয়ই শুনে থাকবে। সে গান আরও একবার শোন। বসন্তকালে ব্যাঙেরা সমস্বরে কলতান ধরে। কিন্তু একক কন্সার্টও শোনা যেতে পারে। ব্যাঙেরা কেবল 'প্রণয়গীতিই' গায় না, তারা কথাবার্তাও বলে। যেমন কোন কোন জাতের ব্যাঙ তাদের আত্মীয়স্বজনকে জোর গলায় জানিয়ে দেয় যে এই জায়গা খালি নেই এবং জায়গার মালিক অতিথির প্রতীক্ষা করছে না।

কোন ব্যাঙ পাড়ে বসে থাকলে তাকে যদি তুমি ভয় দেখাও, তাহলে সে জলে লাফিয়ে পড়বে এবং বিশেষ ধরনে গ্যাঙর-গ্যাঙর করবে। এ হল সঙ্কেত: বিপদ দেখা দিয়েছে!

বসন্তকালে কোন অগভীর জলাশয়ে যদি ট্রাইটনদের* দেখতে পাও, তাহলে তাদের একটু লক্ষ্য করে দেখো, হয়ত বা ট্রাইটনদের অত্যন্ত কৌতূহলজনক কথাবার্তার পরিচয় পাবে। পুরুষ-ট্রাইটন (চিনতে পাবে জ্বলজ্বলে চাকা এবং পিঠ ও লেজ-বরাবর চুড়ো দেখে) সাঁতার কেটে সামনে এগিয়ে যেতে যেতে লেজ দিয়ে স্ত্রী-ট্রাইটনের দিকে সামান্য জলের প্রবাহ ঠেলে দেয়। এই কাজের ফাঁকে ফাঁকে সে থেকে থেকে স্ত্রী-ট্রাইটনের চারপাশে নাচতে থাকে। আবার তার দিকে জলের ধারা ঠেলে দেয়।

তাছাড়া জীব-জন্তুদের ভাষায় যদি আগ্রহী হও, তাহলে শুধু কি এ-ই দেখতে পাবে ও শুনতে পাবে!

কিন্তু আমি জানি তোমরা নির্ঘাত প্রশ্ন করে বসবে: আচ্ছা, জীব-জন্তুর ভাষা নিয়ে চর্চা করাই বা কেন? সিরিয়াস বিজ্ঞানীরা, গোটা একেকটি ইনস্টিটিউট এই প্রশ্ন নিয়ে ব্যাপৃত কেন? কেন লোকে এতে সময়, শক্তি, উদ্যম ব্যয় করছে?

প্রথমত, একটা কথা ভালোমতো মনে রাখবে — কেবল ব্যবহারিক লাভক্ষতির দৃষ্টিতে বিজ্ঞানের চর্চা চলে না। আজ যা অকেজো, জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন বলে মনে হয়, কাল তা বড় রকমের উপকারের সূচনা করতে পারে। এর অনেক দৃষ্টান্ত আছে। জীব-জন্তুর ভাষা তাদের একটি।

* গিরগিটি জাতীয় জলজন্তু।

কিন্তু সে সম্পর্কে বলার আগে আমি তোমাদের একটি কথা ভেবে দেখতে বলি: বহু প্রাচীন আমলেই মানুষ কি জীব-জন্তুর ভাষা কাজে লাগায় নি?

আচ্ছা, অন্তত একটি দৃষ্টান্ত চেষ্টা করে মনে করে দেখ দেখি। যদি না পার ত আমি বলে দিই — কুকুর। আদি পুরুষদের পাহারাদারের কাজ করত, বাইরের মানুষ কিংবা পশু কাছাকাছি চলে এলে সে ঘেউ-ঘেউ বা গরগর আওয়াজ করে সতর্ক করে দিত।

জীব-জন্তুদের কণ্ঠস্বরের সাহায্যে শিকারীরা অনেক সময় শিকারের সন্ধান পান, পথ-আবিষ্কারকরা জানতে পারেন আবহাওয়া। যে-সমস্ত মানুষ জীব-জন্তুদের কণ্ঠস্বর বুঝতে পারেন তাঁরা অবশ্য তা থেকে কত কথাই যে জানতে পারেন তার ইয়ত্তা নেই।

কিন্তু মানুষ জীব-জন্তুদের কণ্ঠস্বর চিনতে পারার মধ্যে, তাদের ভাষা বুঝতে পারার মধ্যেই নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখে না। মানুষ নিজেও এই ভাষায় কথা বলতে শেখে। শেখে গুরুত্ব দিয়ে, যেহেতু জানে যে জীব-জন্তুদের ভাষা রীতিমতো কাজে লাগবে।

আমরা আগেই বলেছি যে কোন কোন কীট-পতঙ্গের মধ্যে আকাশে ওড়ার নির্দেশ দেওয়ার চল আছে। প্রথম প্রথম লোকে এই নির্দেশের কথা জানার পর তাদের আবিষ্কারের উপর তেমন একটা গুরুত্ব আরোপ করে নি — কৌতূহলজনক বটে, কিন্তু ব্যবহারিক কোন লাভ ত আর এতে নেই!

ব্যাঙ

কিন্তু দেখা যাচ্ছে লাভ হলেও হতে পারে, এমনকি বড় রকমের লাভ হতে পারে। পঙ্গপাল-বিরোধী সংগ্রাম সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক কমিশন ইতিমধ্যেই এ প্রশ্ন নিয়ে কাজে নেমেছে। আচ্ছা, আকাশে ওড়ার নির্দেশকে ভয়ঙ্কর শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধের ব্যাপারে কাজে লাগালে কেমন হয়? যেমন ধর, ঝাঁক বেঁধে পঙ্গপাল উড়ে এলো খেতের ওপর, নীচে নামতে না নামতেই বেজে উঠল আকাশে ওড়ার নির্দেশ (বলাই বাহুল্য, এই আওয়াজ তুলে রাখা হয়েছে টেপ-এ)। পঙ্গপাল হয়ত ক্ষুধার্ত, হয়ত বেশি দূর ওড়ার শক্তি আর তাদের নেই, তথাপি নির্দেশ নির্ভুল কাজ করে। অন্য একটি খেতের ওপর উড়ে এলো — আবার নির্দেশ। এবারেও পঙ্গপাল নির্দেশ পালন করবে, এবং করবে ততক্ষণ পর্যন্ত, যতক্ষণ না প্রাণ হারিয়ে লুটিয়ে পড়বে।

তাইগায় অথবা বাদা অঞ্চলে থাকার অভিজ্ঞতা যাদের হয়েছে তারাই জানে যে মশারা কী যন্ত্রণাদায়ক। না মশারি, না ঠাস-বুনানি কাপড়ের পোশাক — কোনটাই কাজে আসে না। আচ্ছা, মশাদের যদি ভয় দেখিয়ে সরিয়ে দেওয়া যায় তাহলে কেমন হয়?

ইঞ্জিনীয়াররা তাই লেগে গেলেন এমন এক যন্ত্র তৈরির কাজে যা বিপদগ্রস্ত মশাদের পিন-পিন আওয়াজ বার করবে। মারাত্মক বিপদের সঙ্কেত দিয়ে যন্ত্রটি রক্তশোষকদের ভয় দেখাবে।

ট্রাইটন

কিছু দিন আগে পর্যন্ত নির্দিষ্ট একটা সময়ে মৌচাষীদের দুর্ভাবনার অন্ত থাকত না — তাদের সবসময় সজাগ থাকতে হত। নতুন মৌমাছিদের জন্ম হতে মৌচাকে স্থান সংকুলান হত না। অবশেষে এমন মুহূর্ত আসত যখন মৌচাক থেকে উড়ে বেরিয়ে আসত নতুন ঝাঁক। মৌচাষী চেষ্টা করত এই মুহূর্তটি যেন হাতছাড়া না হয়ে যায়, সে চেষ্টা করত ঝাঁকের পেছন পেছন গিয়ে তা কোথায় উড়ে যায় খুঁজে বার করে তাকে ধরে এনে নতুন চাকে বসাতে। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই ঠিক সময় কাজ করা সম্ভব হয়ে উঠত না। তাছাড়া চাক থেকে উড়ে যাওয়া ঝাঁক সবসময় খুঁজেও পাওয়া যেত না। কিন্তু মৌমাছিরা ত আর নীরবে ঝাঁক বাঁধে না। তারা সবসময় গুনগুন আওয়াজ করে। পরন্তু. বাড়ন্ত ঝাঁকের আওয়াজ সম্পূর্ণ বিশেষ ধরনের, অভিজ্ঞ ব্যক্তি তা কাজ থেকে ফিরে আসা পরিশ্রান্ত মৌমাছির গুনগুন আওয়াজের সঙ্গে কিংবা ভীতসন্ত্রস্ত কীট-পতঙ্গের ক্রুদ্ধ গুঞ্জনের সঙ্গে গুলিয়ে ফেলবেন না। 'নবজাত' মৌমাছিদের সংখ্যা যত বাড়তে থাকবে, আওয়াজও তত চড়তে থাকবে এবং ঝাঁকের মৌচাক ছেড়ে যাওয়ার মুহূর্তও ততই এগিয়ে আসবে। ১৯৫৯ সালে জনৈক ইঞ্জিনীয়র এক বিশেষ যন্ত্র উদ্ভাবন করেন, যা ঠিক এই আওয়াজে — বাড়ন্ত ঝাঁকের গুঞ্জনে রীতিমতো নিখুঁত ও সঠিক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। আওয়াজ নির্দিষ্ট মাত্রায় পৌঁছুলে যন্ত্র মৌচাষীর বাড়িতে সংকেত পাঠিয়ে দেয়। আর যে-মুহূর্তে মৌমাছিদের আকাশে ওড়ার নির্দেশ আসে ঠিক তখনই মৌচাষী জায়গায় গিয়ে হাজির।

কীট-পতঙ্গের কণ্ঠস্বর জানার সঙ্গে সঙ্গে মানুষ সত্যি সত্যি তা শুনতেও শিখল। দৃষ্টান্তস্বরূপ কাঠ, শস্যের বীজ ইত্যাদির ভেতরে বসবাসকারী অনিষ্টকর পোকা-মাকড়ের কণ্ঠস্বর ধরার এবং জোরাল করার যন্ত্রপাতি বানানো হয়। ধারণা করতে পার, অনিষ্টকর পোকা-মাকড়ের বিরুদ্ধে অভিযানের কাজ এতে কত সহজ হয়!

কুকুর

অনিষ্টকর পোকা-মাকড়ের বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য লোকে ইতিমধ্যেই ঘ্রাণের ভাষা কাজে লাগাতে শিখেছে — তাই দিয়ে কোন কোন জাতের কীট-পতঙ্গকে ভয় দেখাতে, পথভ্রান্ত করতে শিখেছে, অন্যদের বংশবৃদ্ধির পথ বন্ধ করতে শিখেছে।

আর পাখিদের কণ্ঠস্বর? পাখিদের ভাষা হৃদয়ঙ্গম করে মানুষের যে কী লাভ হবে তা এখন ধারণায়ও আনা কঠিন।

কোন কোন পাখি প্রতি বছর প্রায় এক-তৃতীয়াংশ ফলন নষ্ট করে,

বাগান আর আঙুরখেতের প্রচুর ক্ষতিসাধন করে। আমেরিকায় ও ভারতে তারা অনেক সময়ই এত পরিমাণ শস্য নষ্ট করে, যার অভাবে স্থানীয় জনসাধারণ দুর্ভিক্ষ-কবলিত হয়। পাখিদের 'আতঙ্কসূচক চিৎকার' টেপ-এ তুলে রেখে লাউডস্পীকারের মারফত চালিয়ে দেখা গেছে তাতে মাঠ, বাগান কিংবা আঙুরখেত থেকে পাখিদের তৎক্ষণাৎ এবং অনেকক্ষণের জন্য খেদিয়ে দেওয়া যায়।

বোলতা

ইতিমধ্যে বহু দেশে লোকে বিপদ-সঙ্কেতের সাহায্যে ভয় দেখিয়ে পাখিদের তাড়াতে শিখেছে।

এরোপ্লেনের পক্ষেও পাখিরা রীতিমতো বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। যেমন, কানাডায় ১৯৫৬ থেকে ১৯৬৮ সালের মধ্যে এরোপ্লেনের সঙ্গে পাখিদের সংঘর্ষের ৪৮৬টি ঘটনা ঘটে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ঐ একই সময়ের মধ্যে ঘটে ৪৩০টি আর ইংলণ্ডে — ১৪৫টি। সময় সময় এ ধরনের সংঘর্ষের পরিণাম শোকাবহ হয়। এমনকি দুর্ঘটনা যদি নাও ঘটে ত এরোপ্লেনের ধার, এঞ্জিন ক্ষতিগ্রস্ত হয়। পাখির সঙ্গে এরোপ্লেনের সংঘর্ষের পর মাঝারি গোছের মেরামতের পেছনে ইংলণ্ডে খরচ পড়ে ৬·৫ হাজার স্টার্লিং পাউণ্ড। কানাডায় পাখির সঙ্গে সংঘর্ষের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত এরোপ্লেন মেরামতের পেছনে ইতিমধ্যেই খরচ হয়েছে ২০ লক্ষ ডলার।

ইংলণ্ডের বিমান কর্মচারীরা একবার গন্ধ দিয়ে ভয় দেখিয়ে বিমানবন্দর থেকে পাখিদের বিতাড়নের আশায় দু'হাজার স্টার্লিং পাউণ্ড মূল্যের ন্যাপথ্যালীন খরচ করে (কর্মচারীদের জানা ছিল না যে ন্যাপথ্যালীন পাখিদের উপর বিন্দুমাত্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে না, কেননা পাখিদের ঘ্রাণশক্তি অত্যন্ত ক্ষীণ)।

কিন্তু 'আতঙ্কসূচক চিৎকার' দিয়ে ভয় দেখিয়ে যখন পাখিদের তাড়ানোর চেষ্টা করা হল, তখন দিব্যি ফল পাওয়া গেল।

মাছেরাও মনোযোগ থেকে বাদ গেল না, যেহেতু তাদের 'বকবকানি'ও

কাজে লাগানো যায়! আফ্রিকার জেলেরাও মাছেদের 'কথাবার্তা' কাজে লাগায়। কিন্তু মাথা জলে না ডুবিয়ে কিংবা দাঁড়ের সাহায্য ছাড়াও মাছেদের কণ্ঠস্বর শোনা যেতে পারে। এর জন্য আছে বিশেষ ধরনের যন্ত্রপাতি, এমনকি বিশেষ ধরনের জাহাজ। দৃষ্টান্তস্বরূপ 'সেভেরিয়ান্‌কা' নামে ডুবোজাহাজ হাইড্রোফোনের সাহায্যে মাছের ঝাঁক খুঁজে বার করে এবং সেই ঝাঁক কোথায় আছে সে সংবাদ বেতারে মাছধরা জাহাজগুলিকে জানিয়ে দেয়।

মাছের ঘ্রাণশক্তি ভালো? তাহলে ত চমৎকার! মাছেদের লোভ দেখানোর উদ্দেশ্যে, এমনকি লোভ দেখিয়ে জালে ফেলার উদ্দেশ্যে কি এর সাহায্য নেওয়া যায় না? এ নিয়েও বিজ্ঞানীরা কাজ করছেন।

মাছেরা জলের মধ্যে ভালো শুনতে পায়? পায় বৈ কি। আচ্ছা, এটাও ত কাজে লাগানো যেতে পারে। যেমন, কোন কোন মৎস্যপালনকেন্দ্রে জলের ভেতরে ঘণ্টা ডুবিয়ে দেওয়া হয়। ঘণ্টার শব্দে মাছেরা নির্দিষ্ট একটা স্থানে খাবার খেতে আসে।

জলের নীচে যখন বিস্ফোরণমূলক কাজ চলতে থাকে তখন প্রচুর মাছ মারা যায়। লোকে নানা উপায়ে — ড্রামের ঝনঝন আওয়াজ তুলে, এমনকি তড়িৎ প্রবাহ চালিয়েও — ভয় দেখিয়ে মাছেদের তাড়ানোর চেষ্টা করে, কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় না। আচ্ছা, মাছেদের তাড়ানোর জন্য গন্ধ কিংবা 'আতঙ্কসূচক চিৎকারের' সাহায্য নিয়ে দেখলে কেমন হয়? এতে কাজ হবে, হবেই হবে!

কিংবা আরও একটি ব্যাপার: বর্তমানে নদ-নদীতে বহু বাঁধ নির্মাণ করা হচ্ছে। মাছেরা যাতে নদীর স্রোতের ঊর্ধ্বমুখে যেতে পারে কিংবা নিম্নমুখে নামতে পারে তার জন্য তৈরি হয় বিশেষ ধরনের চলাচলপথ — মাছ চলাচলের রাস্তা। মাছেদের একটা অংশ এই রাস্তা ধরে যায়, আবার আরেকটা অংশ যায় না, কোনমতেই যায় না! আচ্ছা, বাঁধ বা জলের নীচের অন্যান্য যে-সমস্ত প্রতিবন্ধকের গায়ে মাছেরা ঠোক্কর খায় তাদের পাশে যদি মাছেদের ভয় দেখিয়ে তাড়ানোর মতো কোন ব্যবস্থা রাখা যায় আর চলাচলের রাস্তায় রাখা যায় ঠিক তার উল্‌টো — প্রলোভন দেখানোর, তাহলে কেমন হয়? কত দামী দামী মাছকেই না বাঁচানো যাবে! এরই উপর এবং আরও বহু প্রশ্নের উপর কাজ করছেন জীব-জন্তুর ভাষা চর্চারত মানুষেরা।

এই কথাই আমি তোমাদের বলতে চেয়েছিলাম উপসংহারের স্থলে।

এছাড়াও বোঝাতে চেয়েছিলাম, কেন বইয়ে শেষ অধ্যায় বলে কিছু নেই।

প্রথমত, এর কারণ হল তোমরা নিজেরাই জীব-জন্তু পর্যবেক্ষণ করে নতুন অধ্যায় লিখতে পার।

দ্বিতীয়ত, শেষ অধ্যায়ে সব শেষ হয়ে যাওয়া চাই। অথচ জীব-জন্তুর ভাষাচর্চা সবে শুরু হয়েছে। প্রতি দিন নব নব আবিষ্কারের সম্ভাবনা আছে, প্রতি দিন মানুষ বহু প্রহেলিকা মীমাংসা করছে। মীমাংসিত প্রশ্নের বদলে আবার আসছে নতুন নতুন প্রশ্ন। সেগুলিরও মীমাংসা চাই। লোকে সে সমস্ত সমস্যা পূরণ করবে।

আমি যতক্ষণ এ বই লিখছিলাম, যতক্ষণ শিল্পী ছবি আঁকছিলেন, এ বই প্রেসে ছাপা হতে যত সময় লেগেছে, এমনকি যতক্ষণ তুমি বইটা পড়ছ, ততক্ষণে বিজ্ঞানীরা অনেক আবিষ্কার করে ফেলেছেন — লিখে ফেলেছেন বহু নতুন নতুন অধ্যায়।

কিন্তু সে হল আরেক বই। তারও শেষ অধ্যায় নেই, কেননা সত্যিকারের বিজ্ঞানের কখনও শেষ নেই।

পাঠকদের প্রতি

বইটির অনুবাদ ও অঙ্গসজ্জা বিষয়ে আপনাদের মতামত পেলে আমরা বাধিত হব।

আশা করি আপনাদের মাতৃভাষায় অনূদিত রুশ ও সোভিয়েত সাহিত্য আমাদের দেশের জনগণের সংস্কৃতি ও জীবনযাত্রা সম্পর্কে আপনাদের জ্ঞানবৃদ্ধির সহায়ক হবে।

আমাদের ঠিকানা:
'রাদুগা' প্রকাশন
১৭, জুবোভ্স্কি বুলভার
মস্কো ১১৯৮৫৯ সোভিয়েত ইউনিয়ন

'Raduga' Publishers
17, Zubovsky Boulevard
Moscow 119859, Soviet Union

লেখক জনপ্রিয় ও চিত্তাকর্ষক ভঙ্গিতে শিশুদের কাছে জীবজন্তুর ‘ভাষা’ চর্চার বিবরণ দিয়েছেন। যে-সমস্ত কীটপতঙ্গ খেতের ফসল নষ্ট করে তাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য অথবা বিপদগ্রস্ত পশুপাখি ও মাছকে উদ্ধার করার ক্ষেত্রে এই সব জ্ঞান মানুষ কী ভাবে কাজে লাগায় তিনি তারও দৃষ্টান্ত দিয়েছেন।

প্রকৃতি ও জীবজন্তুকে ভালোবাসা এবং তাদের রক্ষা করা যে কতখানি গুরুত্বপূর্ণ এই বইয়ে তা স্পষ্ট করে বলা হয়েছে। জওহরলাল নেহরুর কথায়: ‘আমাদের চমৎকার পশুপাখিদের অস্তিত্ব নষ্ট হওয়া মানে জীবন সঙ্গে সঙ্গে হয়ে দাঁড়াবে বৈচিত্র্যহীন ও নিষ্প্রভ।’